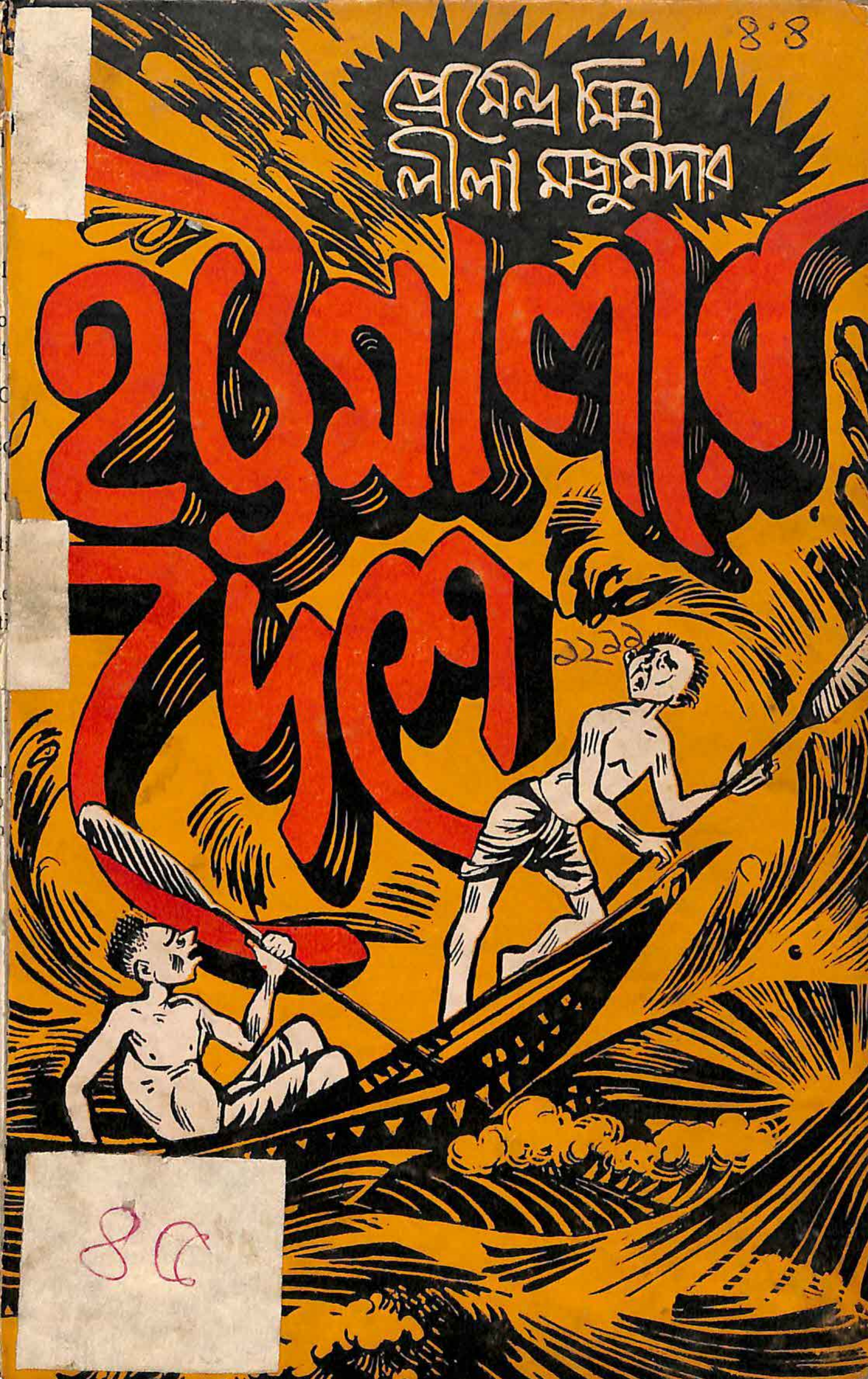

প্রেমেন্দ্র মিত্র
লীলা মজুমদার
হট্টমালার দেশে

[illegible] may be [illegible]

হট্টমালার দেশে



প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ লীলা মজুমদার

অন্যধারা ঃ কলিকাতা-৩৮

প্রকাশক : অন্যধারার পক্ষে
গীতা দত্ত
১২৯/৫৩ এস. এন. রায় রোড
কলকাতা-৭০০০৩৮

মুদ্রক : মলয় ঘোষ
রঞ্জনা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫৯ কাঁকুড়গাছি (২য়) লেন
কলকাতা-৭০০০৫৪

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সুবোধ দাশগুপ্ত

অন্যধারা সংস্করণ : পৌষ ১৩৮৮ : জানুয়ারী ১৯৮২

দাম : দশ টাকা

ছোটদের গল্পের আদিগুরু
শ্রীবিষ্ণুশর্মা স্মরণে

কথায় বলে লেখকেরা চরিত্র সৃষ্টি করেন। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই কি তাই?

আমার নিজের তো মনে হয় সৃষ্টি করার কথা মোটেই সঠিক নয়! জীবনের অভিজ্ঞতার মালমসলা থেকে লেখকের হাতে নানা চরিত্র কিছুটা গড়ে ওঠে নিশ্চয় কিন্তু তা সত্ত্বেও সৃষ্টির চেয়ে আবিষ্কার কথাটাই যেন এক্ষেত্রে বেশী খাটে।

হ্যাঁ, লেখকেরা তাঁদের ভাবনা চিন্তা অভিজ্ঞতার জগতে তাঁদের বিশেষ বিশেষ চরিত্রগুলির মূল সত্তা অন্তত অকস্মাৎ কোন সময়ে যেন আবিষ্কার করে ফেলেন। তারপরে সেগুলির কিছু গড়ন পেটন আর সাজপোষাক পরানোর কাজটাই সৃষ্টি নামে সম্মান পায়।

এ ভূমিকাটুকু লিখলাম আমার সমস্ত লেখার মধ্যে দুটি বিশেষ চরিত্রের কথা বলবার জন্য। চরিত্রগুলি হ'ল রাখাল আর ভূতনাথ ওরফে ভুতো।

সত্যিই বলছি এ দুটি চরিত্র প্রায় আবিষ্কার করে আমি যেমন খুশি তেমনি অবাক ও বিব্রতও হয়েছিলাম।

মানুষের সমস্ত সংসার, সুখ-শান্তি, ভালো-মন্দ, কাজ-অকাজ, দায়-অদায় নিয়ে কতকগুলো অগোছাল জড়ানো ভাবনার জট ছাড়াবার চেষ্টায় কিছুদিন থেকে কটা কাল্পনিক চরিত্র খুঁজে বার করার কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ তার মধ্যে আশাতীত ভাবে এক আবিষ্কার আমার কপালে জুটে গেল।

আবিষ্কার করলাম, একটি নয়, এক সঙ্গে দুটি চরিত্র। রাখাল আর ভুতনাথ ওরফে ভুতো।

কিন্তু এ কিরকম বেয়াড়া আবিষ্কার। রাখাল আর ভুতো। রাখাল একটা সিঁদেল চোর আর ভুতো তার সাগরেদ! সিঁদ কেটে চুরিই তাদের পেশা, কিন্তু এ পশা শহরে-টহরে চালাবার ভাগ্য তাদের নেই। তারা আবাদ অঞ্চলের নেহাৎ গাঁইয়া সিঁদেল চোর। কলকাতা শহরের নামই শুনেছে চোখে দেখেনি কখনও।

এই সিঁদেল চোর রাখাল আর তার সাকরেদ ভুতোই আমার সার্থক আবিষ্কার? তাদের দিয়েই আমার যা কাজ তা সারা হবে? তাদের চোখে আমার দুনিয়াকে দেখিয়ে আমার যা বোঝাবার আমি বোঝাতে পারব?

হ্যাঁ ঠিক তাই। ঘুণ ধরা পচা কাঠের ঘুণ পোকারাই সব চেয়ে খাঁটি পূজারী। পচা কাঠের হাড় হদ্দ খবর তাদের একটু উল্টো পাল্টা ঝাঁকুনি দিয়েই পাওয়া যেতে পারে।

সেই চেষ্টাই করেছিলাম ভুঁইতরাসি গাঁয়ের রাখাল আর ভুতোকে তাদের ডিঙি সমেত গাঙের জলে ডুবিয়ে।

খুশি মনে খুব উৎসাহের সঙ্গেই কাজটা ধরেছিলাম! এগিয়েও ছিলাম বেশ খানিকটা, তার পর আমার স্বভাব গত আলসেমিই শুধু নয় আরও নানা কারণে লেখাটায় বহুদিন হাতই আর দেওয়া হয়নি।

একদিন হঠাৎ অন্য একটা কিছুর জন্যে আমার একটা আলমারির বই কাগজের তাড়া ঘাঁটতে ঘাঁটতে এই লেখাটা আমার চোখে পড়েছে। লেখাটা এমনভাবে পাওয়ার পর তা অসমাপ্ত রাখার জন্য বিবেকের দংশনটা সত্যিই তীব্র হয়েছিল। এ লেখাটা অসমাপ্ত রাখা কেমন যেন অপরাধই মনে হয়েছে নিজের কাছে। একটি পত্রিকার তরফ থেকে বিশেষ তাগিদও ছিল। লেখাটা তাই আর ফেলে না রেখে তাড়াতাড়ি শেষ না করলেই নয় বলে বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু ঠিক পারবো কিনা সে বিষয়ে নিজের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে না পারার দরুণ একজন সহযোগী খোঁজার কথা মাথায় আসে। সে রকম সহযোগী পাওয়া কিন্তু কি সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব। যার লেখার জোড় মেলাবার সূক্ষ্ম দাগটা পর্য্যন্ত বোঝা যায় না এমন সহযোগী শ্রীমতী লীলা মজুমদারের মধ্যে পেয়েছি বলে আমার সগর্ব দাবী।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বহুকাল আগে বিলুপ্ত রঙমশালে হট্টমালার দেশের কয়েক কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু আমি সেটা পড়িনি। বছর কুড়ি আগে বেতার আপিসে প্রেমেন বাবুর কাছে এক নতুন সন্দেশের জন্য একটা ধারাবাহিক গল্প চাওয়াতে, উনি ঐ কটি পৃষ্ঠা আমাকে দিয়ে বলেন, "আমি একা পেরে উঠছি না দুজনে মিলে শেষ করলে, এটা হয়তো সন্দেশে ছাপা যেতেও পারে।"

খুব হতাশ হয়েছিলাম। বাড়ী গিয়ে পৃষ্ঠাগুলো পড়ে আমি স্তম্ভিত। মনে হল এমন অভূত পূর্ব নির্ভীক আদর্শবাদী লেখা শিশু সাহিত্যে খুব কমই আছে। খুসী হয়ে তাঁর কথায় রাজী হয়ে গেলাম।

লীলা মজুমদার

এক

খুনে নয়, ডাকাত নয়, সিঁদেল চোর—রাখালের কথা বলছি গো—ভুঁইতরাসি গ্রামের রাখাল আর তার সাকরেদ ভুতনাথ, ওরফে ভুতো।

ধরা পড়ল না, সেই সেবার হারু মোড়লের বাড়ি সিঁদ কাটতে গিয়ে! মারধোর তো খেল যৎপরোনাস্তি। তারপর তালাবন্ধ রইল রাতের মতো হারু মোড়লের গুদোমঘরে। রাতটা বই তো নয়। সকালেই গিয়ে থানায় দারোগার কাছে ধরে দেওয়া যাবে। এই ঘুটঘুট্টি আঁধার রাতে প্রাণ হাতে করে কে আর যায় তিন ক্রোশ হেঁটে ফাঁড়িতে।

কিন্তু সকালবেলা সবাই গুদোমঘর খুলতে এসে একেবারে তাজ্জব। কোথায় বা রাখাল আর কোথায় বা তার সাকরেদ ভুতো। বোকা বনে গিয়ে কেউ আর আর-কারুর দিকে চায় না, খালি মাথা চুলকোয়।

ছি, ছি, কী আহাম্মুকিটাই হয়ে গেছে! রাখাল আর ভুতোকে ঘরে তো পোরা হয়েছে, কিন্তু সিঁদকাঠিটাই কেড়ে নিতে কারু মনে পড়ে নি! দেয়ালের গায়ে গোল ফোকরটা তাদেরই মতো হাঁ করে আছে।

কিন্তু গেল কোথায় রাখাল আর ভুতো? চোর ডাকাত হলেও কি প্রাণের ভয় নেই! আবাদী গাঁ, দিন-দুপুরে বাঘের ডাক শোনা যায়। আর এই ঘোর অমাবস্যার রাতে তারা বনবাদাড় ভেঙে শুধু জেলখানার ভয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে! উঁহু—তা তো হতে পারে না। জেলখানার ভয় করবে রাখাল আর ভুতো! ব্যাঙের আবার সর্দির ভয়! তাদের জেল বা কী ঘরই বা কী! না, ব্যাপারটা গোলমেলে। খোঁজ করতে হয়।

খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল, গাঁয়ের ঘাটের ওপর তোলা হারু মোড়লেরই ডিঙিখানা নেই।

ঠিক হয়েছে—এই ডিঙি নিয়েই তারা সরে পড়েছে। কিন্তু ডিঙি যে ভাঙা গো—শতেক ফুটো!

তাও তো বটে !

তবে তারা গাঙের জলে ডুবে মরল নাকি ! আহা, একেই বলে নেয়ং ! কেন এ ভুর্‌বুদ্ধি হয়েছিল বাছাদের—মেয়েরা বললে চোখের জল মুছে,—না হয় চার-ছ মাস জেলই খাটতিস !

বেটাছেলেরা বললে, গেছে আপদ গেছে,—কিন্তু বড় নিখখুঁত সিঁদ কাটত—যাই বল আর তাই বল। হাজার হলেও ভুঁইতরাসির ছেলে তো বটে !

রাখাল আর ভুতো সত্যি ডুবে মরল নাকি ! উঁহুঃ—তেমন পাত্তরই তারা নয়। ডিঙি বেয়ে মাঝগাঙে পড়তেই চোরা স্রোতের টানে নৌকো অবশ্য সামাল সামাল। ডিঙি একেবারে তীরের মতো ছুটে চলে।

রাখাল বসেছে হালে আর ভুতো নিয়েছে বৈঠা ! কিন্তু বৈঠা আর চালাতে হয় না।

খানিক বাদে ভুতো ভয়ে ভয়ে বলে,—ও রাখাল, বড় জল যে !

রাখাল খেঁকিয়ে ওঠে,—গাঙে জল হবে না তো হবে কোথায় ?

গাঙে নয়, ডিঙিতে।

অ্যাঁ, বলিস কী ! ডিঙিতে ! ডিঙিতে জল উঠছে নাকি ! ছেঁচে ফেল ছেঁচে ফেল !

কত ছাঁচব ! আর ছাঁচব কিসে ? কিছু তো নেই !

রাখালকে আর জবাবে কিছু বলতে হয় না। হঠাৎ চোরা ঘূর্ণিতে পড়ে নৌকো একেবারে চরকিবাজির মতো ঘুরপাক খেতে থাকে। গাঙের জলেই তারা যে ছিটকে পড়ে না এই আশ্চর্যি।

ডিঙি কিন্তু আর বুঝি বাঁচে না। তাদেরও চোখে সর্ষেফুল ঘুরপাক খেয়ে ! তারপর কী যে হয় !

রাখাল চোখ রগড়ে বলে—দেখ তো ভুতো !

ভুতো দেখে কিন্তু মুখে তার কথা ফোটে না।

রাখাল আবার চোখ রগড়ায়—একবার দুবার তিনবার, তারপর হাত বাড়িয়ে ভুতোকে জোরে একটা চিমটি কাটে।

ভুতো লাফিয়ে উঠে বলে, উঃ—

হুঁ, তুই ঠিক বেঁচে আছিস। কিন্তু আমি! আঙ্‌লটা কামড়া দেখি একটু!

ভুতোকে আর দুবার বলতে হয় না, তার কামড়ের চোটে রাখাল উঠে নাচতে শুরু করে—বেঁচে আছি, বেঁচে আছি, নির্ঘাত বেঁচে আছি! তারপর কষে ভুতোর গালে এক চড় কষায়!

ভুতো কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে,—মারলি যে বড়!

মারব না, আমার আঙ্‌ল কামড়ানো!

বাঃ—তুই তো বললি!

তখন কি জানতাম যে বেঁচে আছি!—অম্লান বদনে বলে রাখাল। তারপর তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—যাক, তুই কামড়েছিস, আমি চড়িয়েছি—শোধবোধ হয়ে গেছে! শুধু একটু চিমটি না হয় তোর পাওনা রইল।—কিন্তু এ কোথায় এলাম বল্‌ তো! ডিঙিটাই বা কখন ডুবল, সাঁতরেই বা কখন এলাম! মনে পড়ছে কিছু!

ভুতো মাথা নাড়ে।

রাখাল বলে,—ঠিক চিনতেও তো পারছি না। এ তল্লাটে সব আবাদী গাঁ-ই তো চিনি, এটা আবার কবে কে বসাল? ঠিক গাঁ বলেও মনে হচ্ছে না।

ভুতো খানিক মাথা ঘামিয়ে বলে,—এটা বোধহয় কলকেতা!

তোর মাথা! ভুঁইতরাসি থেকে কলকেতা অমনি গেলেই হল। মহকুমা থেকে সদর, সদর থেকে কলকেতা। তোর আমার মতো সিঁদেল চোরের কর্ম নয়, জাল জুয়াচোর, খুনে লেঠেল না হলে আর কলকেতার কয়েদে পাঠায় না বুঝেছিস!—আর কলকেতা হলে টেরামগাড়ি কোথায়!

টেরামগাড়িটা ঠিক কী বস্তু ভুতো জানে না, তবু চারিদিকে কোনরকম গাড়িরই সন্ধান না পেয়ে জায়গাটা কলকাতা নয় বলেই তার মনে হয়।

কিন্তু ওই যে পেল্লায় পেল্লায় কোঠাগুলো—ওগুলো কী? গাঁয়ে কি অমন কোঠা হয়!

তা হয় না বটে—রাখালকে সে কথা স্বীকার করতেই হয়। গাঁয়ে কেন, সেবার ধরা পড়ে সদরে গিয়েও তো সে অমন কোঠা দেখে নি। আর শুধু কি কোঠা,—রাস্তাঘাটগুলো কী রকম! যেন সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যায়, আর কী-সব কেয়ারি-করা ফুলের বাগান! তার মাঝে মাঝে ফোয়ারা!

তার ভাবনায় বাধা দিয়ে ভুতো বলে,—হুঁ, ঠিক হয়েছে, ও কোঠাগুলো কিসের বুঝেছি।

কী বুঝেছিস?

ওগুলো জেলখানা!

জেলখানা! জেলখানা তো একটাই হয়—রাজ্যসুদ্ধ জেলখানাই এরা বানিয়েছে নাকি? মুল্লুকসুদ্ধ সবাই তাহলে চোর?

ভুতো নিজের ভুলটা বুঝতে পারে, সবাই চোর হলে চুরি করবে কার! তা ছাড়া জেলখানায় কি অত জানলা দরজা থাকে,—সে দরজা আবার অমন হাট করে খোলা! নাঃ, ব্যাপারটা ভারী গোলমেলে।

তখন তো সবে ভোর।

তারপর বেলা যত বাড়ে ব্যাপারটা ততই গোলমেলে হয়ে ওঠে, রাখাল আর ভুতো থই পায় না।

যেমন তাজ্জব মুল্লুক, তেমনি অদ্ভুত সব লোকজন।

ভালো করে সকাল হতেই দলে দলে তারা সেই সব কোঠা থেকে বেরোয়—ছেলে মেয়ে জোয়ান বুড়ো, রং-বেরঙের তাদের পোশাক। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। তারা আবার গানও গায় পথে যেতে যেতে!

আজ বোধহয় এদের গাজনের সং বেরিয়েছে!—ভুতো অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে মন্তব্য করে।

তুই যেমন আহাম্মুক, আশ্বিন মাসে গাজন হয় নাকি!—রাখাল তাকে ধমকে দেয়, কিন্তু এমন রংবেরঙের সাজের মানে খুঁজে পায় না নিজে।

একদল লোক তাদের দিকেই আসে। সরে পড়তে গিয়েও রাখাল

আর ভুতোর সরে পড়া হয় না। লোকগুলো তাদের দেখে ফেলেছে, আগেই।

রাখাল ভুতোকে আগে থাকতে সাবধান করে রাখে,—খুব হুঁশিয়ার. বেফাঁস কিছু বলে ফেলিস নি যেন!

কিন্তু লোকগুলো তাদের কোন কথাই শুধোয় না। শুধু একটু হেসে তাদের সম্ভাষণ করে তারা গাঙের ধারে ছোট ছোট সব ডিঙিতে গিয়ে ওঠে।

তাই তো! গাঙের ধারে এতগুলো এমন সুন্দর ডিঙি বাঁধা ছিল এতক্ষণ তো চোখে পড়ে নি! জেলে ডিঙির আবার এমন রংবেরঙের চেহারা হয় নাকি!

রাখাল আর ভুতোকে এবার নিজে থেকেই তাদের দিকে এগুতে হয়।

মাছ ধরতে চলেছ বুঝি তোমরা?

মাছ ধরতে?—তাদের একজন হেসে জবাব দেয়—হ্যাঁ, মাছও ধরব বই কি!

দেখো কথার ছিরি, মনে মনে ভাবে রাখাল—ডিঙি নিয়ে গাঙে চলেছেন—তবু বলে, মাছও ধরব বইকি! মাছ ধরবি না তো কি মজা করতে বেরিয়েছিস হতভাগারা?

মুখে সে হেসে বলে,—মাছের দর কী রকম এখানকার বাজারে?

বাজার!—লোকগুলো সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

কালা নাকি সব? রাখাল আবার গলা চড়িয়ে বলে,—মাছের বাজার গো, মেছোহাটা—মাছ বিক্রি হয় যেখানে। সেখানে মাছের কী রকম দর মেলে?

লোকগুলো এ-ওর মুখের দিকে চায় আবার।

একজন এগিয়ে এসে বলে,—বুঝেছি। তোমরা হট্টমালা থেকে আসছ?

এবার রাখাল আর ভুতোর চোখ কপালে ওঠে,—হট্টমালা! সে আবার কোথাকার দেশ!

লোকগুলো হেসে উঠে বলে, আরে, তা কি আর জানি! তবে সেই দেশেই শুনেছি যত সব উলটোপালটা কাণ্ড।

নাঃ, এই আহাম্মকগুলোর সঙ্গে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং এদিক ওদিক একটু ঘুরেফিরে দেখা যাক। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ কাউকে হয়তো পাওয়াও যেতে পারে।

এদিক ওদিক ঘুরতে শহরের বুঝি মাঝখানটায় গিয়ে পড়ে।

কিন্তু এ কী রকম শহর!

ভুতোটা একটু আদেখলে। যা দেখে তাতেই খুশিতে ডগমগ। বলে, খাসা শহর কিন্তু।

খাসা শহর! রাখাল খেঁকিয়ে ওঠে, খাসাটা কোনখানে শুনি। শুধু বাইরে খোসা দেখেই মজে গেলি। বলি খাসা শহর তো গাড়ি ঘোড়া কই? ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি কোথায়? তাছাড়া পাহারাওয়ালা কনেষ্টবল দেখেছিস একটা?

তাও তো বটে! ভুতোর খেয়াল হয়। এতক্ষণ ঘুরল ফিরল, একটা পাহারাওয়ালা চোখে পড়ল না! শহরটার ওপর ভুতোর ভক্তি একটু চোট খায়।

রাখালই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে মুরুব্বির মতো বলে,—আসল ব্যাপার কী জানিস? এখানে সব টিকটিকি!

টিকটিকি!

টিকটিকি জানিস না! হাঁদা কোথাকার! পুলিশের লোক কিন্তু সাজ-পোশাক নেই, ভালমানুষ সেজে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এখানে সেই সব টিকটিকির কারবার, নইলে পুলিশ না থাকলে শহর চলে!

পুলিশ না দেখার মানেটা খুঁজে বার করে রাখাল খুশী হয়ে হনহন করে খানিক এগিয়ে যায়। তারপর খেয়াল হয় ভুতোটা সঙ্গে নেই।

হতভাগা আবার গেল কোথা।

এদিক ওদিক চেয়ে নজরে পড়ে, ভুতো রাস্তার মোড়ে এক জায়গায় গবেটের মতো দাঁড়িয়ে কী দেখছে।

মাথায় একটা চাঁটি দেবার লোভ কোনরকমে সামলে রাখাল কাছে এসে গর্জে ওঠে, হাঁ করে দেখছিস কী দাঁড়িয়ে?



—হ্যাঁ মাছও ধরব বই কি!

দেখছি না কিছু, ভাবছি।

ভাবছিস? তুই!—রাখাল প্রায় টলে পড়ে আর কি ঃ অবাক হয়ে তার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বলে, তারপর কী ভাবছিস শুনি?

ভাবছি, চোখে এমন অন্ধকার দেখছি কেন? বোধহয় ক্ষিদে পেয়েছে।

তাই তো, ভুতোটা তো একেবারে নিরেট নয়। খাবার ভাবনা তো একটু ভাবতে হয়। সেই কাল সন্ধ্যা রাতে দুটো পান্তা ভাত খেয়ে বেরুবার পর থেকে পেটে তো একটা দানা পড়ে নি। সেখানে তো আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে। সে আগুন নেভাবার ব্যবস্থা না করলে নয়। কিন্তু করবে কোথায়! কাউকে শুধোতে গেলে আবার বলে না বসে—খাওয়া! সে আবার কী! তোমরা বুঝি হট্টমালা দেশ থেকে আসছ।

না, নিজেদেরই খুঁজে পেতে একটা উপায় করতে হবে।

উপায় একটা বার হয়।

এধারে ওধারে একটু ঘুরতে ফিরতেই খাবার জায়গা মিলে যায়। জায়গাটা যে পেটপুজোর তা আর কাউকে জিগ্যেস করে জানবার দরকার নেই। মস্ত এক দালান, খোলা দরজা দিয়েই দেখা যাচ্ছে সারে সারে লোক ভেতরে সব খেতে বসেছে। রান্নার গন্ধে রাস্তাই আছে আমোদ হ'য়ে।

সে গন্ধেই খিদেটা যেন আরও চনচনিয়ে ওঠে। আকুলি বিকুলি করে প্রাণটা ভেতরে গিয়ে বসবার জন্যে। কিন্তু গিয়ে যে বসবে ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ। কোমরে লুকিয়ে বাঁধা সিঁধকাঠিটা ছাড়া একটা সিসের টুকরোও তো সঙ্গে নেই। দোকানী যখন পয়সা চাইবে তখন পয়সা না পেলে কী করবে? মারধোর করবে না হাজতে পাঠাবে! তো যা করে করুক। পেটে খেলে পিঠে সয়।

ভাবতে ভাবতে রাখাল মরিয়া হয়ে ওঠে।

ভুতোকে কানে কানে একটা মতলব বাতলে দিয়ে গটগট করে গিয়ে ঢোকে ভেতরে।

ভয় শুধু এখন—খেতে বসার আগেই না ঘাড় ধরে বিদেয় করে।

দুই

না, ঘাড় ধরে বিদেয় তো কেউ করল না।

তার বদলে খাতিরের বহর দেখেই তারা ভ্যাবাচাকা।

আসুন, আসুন! এই যে এদিকে এসে বসুন।

না না, ও টেবিলে কেন, এইখানে বসুন। আমাদের ভোজমহলটা সব দেখতে পাবেন, সেই সঙ্গে বাজনদারদেরও কেরামতি শুনবেন কাছে থেকে।

বলি ব্যাপারটা কী!—রাখাল আর ভুতো এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে শুধোয়,—আমাদের নিয়ে তামাশা করছে নাকি! বেশ খানিকটা নাচিয়ে নিয়ে তারপর দেবে হুড়ো, সেই সেবার ভুঁইতরাসীর ওপারের গাঁ কুমিরপোতাতে যেমন করেছিল জমিদারের কানা গোমস্তা হাজু গোঁসাই। গোড়ায় যেন জামাই-আদর করছে। আসুন আজ্ঞে, বসুন আজ্ঞে, ওরে, চৌকি আন পাখা আন জলখাবার দে। এঁরা কত কষ্ট করে গাঙ পেরিয়ে এসেছেন আমাদের কৃতার্থ করতে। একটু সেবা করে ধন্য হই। তারপর সত্যিই একজন নিয়ে আসে বসবার পিঁড়ে, আর একজন ধরে তালপাতার পাখা। তারপর হাজু গোঁসাই হাঁকে, জলখাবার কই রে! মনমোহন গুঁতোর লাড়ু, দাঁতে-নোড়া রসবড়া, চামড়া-তোলা গোকুল পিঠে, গলায়-গামছা আনন্দলাড়ু। হ্যাঁ, দিলে সেই সবই খাইয়ে। মুখে ননীর মত মোলায়েম মিষ্টি মিষ্টি আদর, আর সেই সঙ্গে পেটে পিঠে মাথায় গুঁতো চাবুক গাঁট্টা। আহা রসবড়াটা কেমন হয়েছে, বলে কষে দু গালে চাপড়। এই চন্দ্রপুলি আর একটু খান, বলে মাথায় গাঁট্টা আর গোকুল পিঠেটা বুঝি মনে ধরছে না, বলে পিঠে জলবিছুটির ঘা। তবে মন্দর মত মন্দ বটে কানা হাজু গোঁসাই। এদিকে প্রজার গলায় গামছার পাক দিয়ে নেংড়াচ্ছে, ওদিকে জমিদারকে ফাঁক করছে মাথায় হাত বুলিয়ে। অমন মানুষের হাতে হাড়গোড় ভাঙিয়েই সুখ।

তা এরাও তেমনি কিছু করার পাঁয়তাড়া কষছে নাকি !

দুজনে ততক্ষণে বসেছে তো এক ধারের টেবিলে। চেয়ার টেবিলের বাহার আবার কত। চেয়ার নয় আদরের কোল, বসলে ডুবে যেতে হয়। আর টেবিল সব ঝকঝক তকতক করছে—যেন কড়ি আর কাঁচকড়া মিলিয়ে তৈরী। টেবিলের ওপর আবার কত কায়দার সব ফুলদানি। কেন বাপু, বেঞ্চি পেতে গোলপাতার ঠোঙায় খাবার দিলেই তো হয়। হাতে হাতে দিলে, খাওয়া হলে এঁটো ঠোঙা দিলে আঁস্তাকুড়ে ফেলে—সব ল্যাঠা চুকে গেল।

এত যখন ভড়ং তখন গোড়ায় গলদ আছে নির্ঘাত কিছু। উদোমার্কাগুলো এধারে ওধারে খাচ্ছে বটে তারিয়ে তারিয়ে, কিন্তু খাবার বোধ হয় মুখে তোলা যাবে না। ওপরে চিকনচাকন ভেতরে খড়ের নুড়ো। যেমন ঠগবাজিতে পড়েছিল ভুঁইতরাসীর হারু মোড়লের জামাই বংশী কয়াল।

কয়াল বাবাজীবন সত্যি সত্যি একবার কলকাতায় গেছল ছোট আদালতে সাক্ষী দিতে। শখ করে গেছলেন বাছাধন শহরের মধ্যিখানে কোন্ বিলিতি ময়রার দোকানে, ওই যেখানে গোরা সেপাই সাহেবসুবো সব যায় গো। জমিদারের হয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিতে এসে ট্যাক কিছু ভারী হয়েছিল কিনা, তেল হয়েছিল একটু ছিটের কামিজ, বাঁদিপোতার ধুতি পরে। তা বিলিতি ময়রার দোকানে ঢুকেই তো দিশেহারা। পাহারাওয়ালা কি পেয়াদা নয়, তবু তার চেয়েও জমকালো সব সাজ পরে কারা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঢুকতে না ঢুকতেই সামনে এসে খাড়া। কোতল করবে নাকি। ওসব কিছু নয়, তারা হল সব ময়রার খিদমদগার। ফাইফরমাশ খাটে, খাবার এনে দেয়। এক জায়গায় টেনে বসিয়েই একটা ছাপানো বাঁধানো কাগজ এনে সামনে ধরলে। এ আবার কী গো! ময়রার দোকানেও হলফ করতে হয় নাকি কাগজ দেখে? তা নয়। ওই হল খাবারের ফিরিস্তি। ওসব হিজিবিজির বোঝে কী! চোখ বুজে আঙুল দিয়ে দিল এক জায়গায়। তারপর কী সব কাণ্ড। এই এল গেলাসভরা জল। এই এল চিনেমাটির রেকাবি। খাবার কই তাতে! রেকাবি তো খালি! তার পাশে এসব খুদে খুদে

হাতা খন্তি ঝাঁঝরি আবার কেন? ওইগুলোই চুষবে নাকি। না না, খাবারও এল তার পর। যেমন তার ছিরি তেমনি তার খোশবো। মুখে দিতে না দিতেই গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। দাঁতে এক টুকরো কাটল না তবু ছুটি কান কেটে সেই খাবারের দাম আদায় করে নিলে। আবার তার সঙ্গে ময়রার মুনিষের ঘুষ। ট্যাঁক তো ট্যাঁক, কোঁচার খুঁটে কাছার খুঁটে গিঁট দিয়ে বাঁধা পয়সাও খুলে বার করে আক্কেল-সেলামি দিতে হল।

সেই রকম কিছুই হবে বোধ হয় এখানে। তবু কয়াল বাবাজীবনের পাতে কিছু সত্যি পড়েছিল, এখানে হাজু গোঁসাই-এর গুঁতোই শুধু খেতে হবে কিনা কে জানে।

ও বাবা! টেবিলের ধারে এ দুজন আবার দাঁড়িয়ে কেন? মুখে তো মিষ্টি মিষ্টি গলে-পড়া হাসি। পেটে পেটে কি জিলিপির প্যাঁচ?

কী, বলে কী ডান ধারের আহাম্মকটা? কী আপনাদের অভিলাষ?

বুঝেছি। এ দোকানের মালিক না হয়ে যায় না। ওই অমায়িক হাসি দেখেই চেনা যায়। নির্ঘাত এই মালিক।

কিন্তু বাবা! ওসব পুরুতমন্তরের বুলি যা-ই ছাড়ো না, সহজে ফাঁদে পা দিচ্ছি না।

বলি বসালে তো খুব আমড়াগাছি করে। রাখাল খোঁচা দিয়ে বলে,— ডান হাতের ব্যবস্থা কিছু হবে?

আরে সেই জন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি তখন থেকে। কী তোমাদের ইচ্ছে বলো।

মালিক না হলে এসব বোলচাল কার! আমাদের কী ইচ্ছে জানবার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে! রাখাল ভুতোকে চোখের ইশারা করে। কিন্তু ভুতোটা তো মানুষ নয়, আস্ত একটা ভূত। হাঁ করে চেয়ে আছে পাশের টেবিলের খাবারের থালার দিকে। চেয়ে চেয়ে আবার ঢোক গিলছে হতভাগা!

রাখালেরই একটা কিছু না বললে নয়। মুখ্যু বলে ধরা না পড়তে চাইলে একটু গরম মেজাজ দেখানো ভালো।

রাখাল তাই দাঁতমুখ খিচিয়ে বলে,—ইচ্ছে আবার কী বলব। তোমাদের ভালোমন্দ কী আছে নিয়ে এসো। আগে চেখেই দেখি, তারপর ফরমাশ!

তাই আনছি। বলে ডান দিকের আহাম্মকটা—মানে দোকানের মালিক নিশ্চয়,—যদি-বা চলে যায় বাঁ দিকেরটা তখনও খাড়া।

তোমার আবার কী মতলব বাছা? একজন তো খানা আনতে গেলেন। খানার ওপর আবার দানা কিছু আছে নাকি?

হ্যাঁ, রাখাল ঠিকই ধরেছে। ডান ধারের উনি ছিলেন খানা-র আর বাঁ ধারের ইনি হলেন দানা-র অর্থাৎ গানবাজনার কর্তা। ওই যাকে বলে অধিকারী আর কি!

কী গানবাজনা শোনাতে আজ্ঞা হয়?—এই হল তাঁর নিবেদন।

কী গানবাজনা? এই সেরেছে! কে জানে গানবাজনার ফরমাশ দিতে না জানলে এ বিদঘুটে আহাম্মকদের দেশে হয়তো খেতেও দেয় না। কিন্তু আজ্ঞাটা দেবে কী! রাখালের আবার গানবাজনার ব্যাপারেই জ্ঞানগম্যি বোধভাষ্যি কিছু নেই। যা শোনে তাই কানে একরকম ঠেকে। মানে সবই গোলমাল। কোনটা একটু মিঠে কোনটা বা কড়া। ভুতো হতভাগা তো মাঝে মাঝে পাঁচালীর আসরে খঞ্জুনি বাজায়। তা সে হতভাগাকে দিয়ে কোন সুবিধে হবে! এ টেবিল থেকে ও টেবিলে বেহায়ার মত শুধু খাবারই দেখছে। মনে মনে চাখছেও বোধ হয়। জিভটা বহুরূপীর গোসাপের মত লম্বা হলে বুঝি বাড়িয়ে বুলিয়েও নিত লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে।

ইদিকে গানবাজনার অধিকারী মুখের দিকে তাকিয়ে আছে যে হাপিত্যেশ করে। রাখালকে বড় গোছের সমঝদার ভেবেছে কি না কে জানে। যাই হোক মানটা বজায় রাখতে হয়। হয়েছে! হয়েছে! খুব ভালো ফরমাশই মাথায় এসেছে।

রাখাল ভারিক্কি চালে বলে,—গানবাজনা শোনাতে চাও। বেশ! বেশ! পেরথমে খিদেটা চনমনে করার মত কিছু বাজাও তো বাপু, শেষে না হয় হজমী কিছু বাজিও!

কী বললে?



সত্যিকার খাবার আনছে তারা থালায় বাটিতে রেকাবে—

অধিকারীর চোখ দুটো একটু ছানাবড়া গোছের হয়ে উঠেছে যেন। ভ্যাবাচাকা খাওয়াবার এ মওকা আর রাখাল ছাড়ে!

বলে,—এই সোজা ফরমাশটা বুঝতে পারলে না। কী রকম বাজনদারের দল হে তোমার? খানার সঙ্গে বাজনা যদি হজমীগুলির কাজ না করল, তবে বাজানো কেন? বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে বসে খাওয়া যায় ওসব ঝামেলা না হলে।

লোকটা একটু টলতে টলতেই যেন চলে যায় মনে হয়। কিংবা ওই রকমই হয়তো তার চলন।

এবার রাখালকে খেয়ে-দেয়ে ফাঁকি দিয়ে পালাবার ফন্দিটা ভাবতে হয়।

কিন্তু সব ভাবনাচিন্তা তার ধোঁয়া হয়ে উবে যায় দোকানের মালিককে—মালিক ছাড়া আবার কে সে—আর দুজনের সঙ্গে আসতে দেখে।

কুমিরপোতার হাজু গোঁসাই-এর কোঁতকা নয়, সত্যিকার খাবার আনছে তারা থালায় বাটিতে রেকাবে—পরাতের ওপর সাজিয়ে!

খাবার দেখে যত না, তার চেয়ে বেশী তাজ্জব থালা বাটি গেলাস দেখে।

খাবার রেখে যেতে না যেতে ভুতোটা তো হুমড়ি খেয়ে পড়ে টেবিলের ওপর, গোরু যেন জাবনার গামলায়।

রাখালের কিন্তু হাতই ওঠে না মুখে খাবার তুলতে।

উঠবে কী করে? থালাগুলো যে আসল সোনার, বাটিগুলো চাঁদির আর গেলাসগুলো ওই যে ফটিক না কী বলে তারই।

ভুতোকে কনুইএর একটা গুঁতো দিয়ে বলে,—বুঝেছিস কিছু ব্যাপারটা? শুয়োরের মত খাচ্ছিস কী!

খাব না তো কী! এমন খাওয়া জন্মে কখনো খাই নি। একবার চেখেই দেখো।

ভুতো আর বৃথা বাক্যব্যয় করে না।

রাখালকে তখন আরেকটা গুঁতো দিতেই হয়, একেবারে কণ্ঠা বরাবর। সেই সঙ্গে দাঁতখিচুনি,—থালা-বাটিগুলো কিসের একবার দেখেছিস!

দেখবে কী, ভুতো আচমকা কনুইএর গুঁতোয় বিষম-টিষম খেয়ে কেলেঙ্কারি বাধায়।

কী ভাগ্যি, বাজনদারেরা তখন তাদের বাজনা শুরু করে দিয়েছে। নইলে লোকজন ছুটে আসত নিশ্চয়।

বিষম সামলে উঠে ভুতো হাঁ করে রাখালের দিকে তাকায়। তারপর হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে বলে,—থালাগুলোর কথা কী বলছিলে?

আরে চুপ! চুপ! রাখালকে ফিসফিস করে ধমক দিতে হয়,—সবাই শুনতে পাবে যে!

শুনল তো হল কী?—ভুতো গবেটের মত গাঁক গাঁক করে জবাব দেয়,—আমরা কারুর থালা তো আর চুরি করছি নে যে ভয় করব!

দোহাই তোর! তুই একটু থাম!—রাখাল দাঁত কিড়মিড় করে মিনতি করে ভুতোকে,—থালার কথা কিছু আমি বলি নি!

আলবত বলেছ!—খেয়ে-দেয়ে ভুতোর স্ফূর্তি আর সাহস দুই বেড়েছে, বলতে দোষটাই বা কোথায়! এখানকার দোকান ভালো, মানুষ ভালো, টেবিল ভালো, চেয়ার ভালো, বাজনা ভালো, খাবার ভালো, খাবারের থালাবাটি ভালো।

রাখালের নিজের দু গাল চড়াতে ইচ্ছে করে, তার চেয়ে বেশী অবশ্য ভুতোটাকে একটা রাম গাঁট্টা দিয়ে বেহুঁশ করতে। দুটো ভালোমন্দ খেয়েছে বলে হতভাগা একেবারে যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে! ওই যা ভয় করেছিল তাই। মালিক যে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে টেরই পায় নি। এবারে ধরে বুঝি ক্যাঁক করে।

ধরপাকড় অবশ্য তখুনি তখুনি করে না। তার বদলে হেসেই বলে, থালাবাটির কথা কী বলছিলে ভাই।

এবার রাখালকেই বিষম খেতে হয়। আমতা আমতা করে বলে,—না, মানে বলছিলাম, থালাবাটিগুলো যেন সোনা চাঁদির বলে মনে হচ্ছে।

বাঃ—দোকানদারই অবাক,—সোনা চাঁদির ছাড়া থালাবাটি আবার হয় নাকি!

ভুতোর চোখ এতক্ষণে কপালে উঠেছে হতভম্ব হয়ে। বলে,—কী বললে? এসব আসল সোনা রুপো! আর এই জিনিস দিয়েছ কিনা আমাদের!

তোমাদের কেন, সকলকেই তো দিয়েছি। আর তোমরা হলে এখানে নতুন মানুষ, আমাদের অতিথ। স্যাকরাবাড়ি থেকে নকশাদার বাসনগুলো এখনো এসে পৌছোয় নি তাই। নইলে তোমাদের এই থালাবাটিই দিতাম নাকি! তা থালাবাটি যেমন হোক খাবারদাবার কেমন তা তো কই বলছ না!

বলছি, বলছি, আগে খেয়ে-দেয়ে ঢেঁকুর কেমন ওঠে দেখি, তারপর তো বলব।

রাখাল এতক্ষণে একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচে খাওয়ায় মন দেয়।

থালাবাটিগুলো চেটেপুটে সাফ করবার পর ভুতোর ওপর রাগটা তার চিড়বিড়িয়ে ওঠে। দোকানের মালিক—মালিক তো বটেই—তখন চলে গেছে। দাঁতে দাঁত ঘষে সে চাপাগলায় বলে, আহাম্মুক! আর একটু হলে দিয়েছিলি সব মাটি করে। আমাদের টাঁক আছে একবার বুঝলে আর এ জিনিস রাখবে এমন হেলায় ফেলায়! মাটির তলায় কোন লোহার সিন্দুকে চালান করে দেবে, গণেশ ঠাকুরের ইঁদুরও শুলুকসন্ধান পাবে না।

ভুতো একটু লজ্জা পেয়েই বোধ হয় গোঁজ হয়ে চুপ করে থাকে প্রথম। তারপর সেও মেজাজ দেখায়। বলে, সোনা চাঁদির থালাবাটি তো হাতাবে ভাবছ, তার আগেই যে কোমরে দড়ি পড়বে সে খেয়াল আছে! খাবারের দাম কী করে দেবে শুনি!

সে আমি ঠিক করে ফেলেছি, তোকে ভাবতে হবে না। —রাখাল ভুতোর কানে কানে পরামর্শটা দিয়ে দেয়।

তারপর কাপড়ে যেন আগুন ধরেছে ভুতোর এমনি পাঁই পাঁই করে ছুট।

ধর! ধর! বলতে বলতে তার পেছনে রাখাল।

ভুতো তো চক্ষের নিমেষে দোকানের দরজা ছাড়িয়ে পগাড় পার। ধরা পড়তে রাখালই আটকা পড়ে যায়।

কী হল ভাই? ব্যাপার কী? হঠাৎ মজার ছুটোছুটি।

দোকানের সবাই বুঝি রাখালকে ঘিরে ধরে।

কী হল, দেখতে পেলে না!—রাখাল যেন খাপ্পা, টাকার থলেটা নিয়ে পালিয়ে গেল যে!

ওঃ, টাকার থলে !

যেন ব্যাপারটা গায়ে মাখবারই নয় এমনি করে হেসে একজন বলে, একটু তামাশা করতে শখ হয়েছে বোধ হয় ! ও এখুনি ফিরে আসবে।

হ্যাঁ আসবে ! টাকার থলে নিয়ে কেউ ফিরে আসে !—রাখাল ঝাঁঝিয়ে ওঠে,—আর এখন আমি দোকানীর দেনা শুধব কিসে !

দোকানীর দেনা !—সবাই যেন আকাশ থেকে পড়ে।

কিছু যেন বুঝতে পারছ না, না ?—রাখালকে এবার খেঁকিয়ে ওঠার ভান করতে হয় না,—ভালোমন্দ যেসব খেলাম তার দাম দেব কোথা থেকে এখন শুনি ?

ওঃ, এই কথা ! দোকানসুদ্ধ সকলের কী হাসির ধুম !

খেয়ে-দেয়ে আবার বুঝি দাম দিতে হয় ?—একজন বলে,—তোমরা বুঝি হট্টমালার দেশ থেকে আসছ ?

হ্যাঁ আসছি ! জাহান্নম থেকে আসছি ! বলে রাখাল গটগট করে বেরিয়ে যায়। মিনি মাগনা খেয়ে যাওয়ার সুবিধেতেও তার রাগ পড়ে না।

তিন

এখন শুধু রাতটা একবার হলে হয়।

রাখাল আর ভুতোর হাতগুলো বুঝি নিশপিশ করতে থাকে সিঁধকাঠি নাড়বার জন্যে। এমন সুবিধে কি আর হয়। একটা থালা সরাতে পারলেই তো জন্মের মতো আর ভাবনা নেই। পায়ের ওপর পা দিয়ে দিন চলে যাবে। একটার বদলে এখানে তো থালার কাঁড়ি—সোনার থালার পাহাড়!

একটা থালার সোনা বেচলেই তো পায়ের ওপর পা। এতগুলো সোনা পেলে কী যে হবে সে বিষয়ে ভুতোর রীতিমত ভাবনা ধরে যায়!—এত ঐশ্বর্যি নিয়ে করব কী বল্ তো!

কী যে করবে তা রাখালও ভাল করে ভেবে পায় না। তবু ভুতোর ওপর সে চটে উঠে দাঁত খিঁচোয়—শোনো কথা! সোনা নিয়ে করব কী! রাজার মতো খাব দাব ফুর্তি করব।

রাজার মতো খাওয়াটা যে কী ভুতোর সে বিষয়ে ঠিক ধারণা নেই। তবু এইমাত্র যে রকম খাবারের নমুনা চেখে এসেছে রাজার খাবার সেই রকম একটা কিছু হবে বলে সে ধরে নেয়, কিন্তু সোনার কাঁড়ি তাতেও যদি না ফুরোয়! —তখন!

তখন তাল তাল করে সোনা জমাব, বুঝেছিস! ঘরভর্তি সোনা— রাখাল তাকে বুঝিয়ে দেয়।

শুধু জমাব!—কিন্তু চুরি যদি কেউ করে নেয়?—ভুতো জিজ্ঞাসা করে।

রাখাল খেঁকিয়ে ওঠে—বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। আমাদের কাছ থেকে চুরি করবে সোনা! সাত-ডুব দীঘির তলায় যখ দিয়ে পুঁতে রাখব না!— কে ছোঁবে সে সোনা!

সোনা যদি পুঁতেই রাখল তবে তাতে আর লাভ কিসের, ভুতো ঠিক বুঝতে পারে না। তবু রাখালের কাছে দাঁতখিচুনি খাবার ভয়ে আর সাহস পায় না কিছু জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু রাত যেন আর হতে চায় না।

এদিক ওদিক ঘুরে আজব দেশের নানা তাজ্জব ব্যাপার দেখেও রাখাল আর ভুতোর সময় যেন আর কাটে না। আর খুব বেশী মেলামেশা করে সব জায়গা দেখাশুনো করতে তারা ভরসাও পায় না। কোথায় কে চিনে রেখে দেবে কে জানে। তারা ঘোরাঘুরি করে,—কিন্তু আনাচে কানাচে।

— রাত যদি বা হল তবু এ পোড়া রাজ্যের মানুষগুলো যেন ঘুমোতে জানে না। এখানে গান ওখানে বাজনা, সেখানে হাসি হট্টগোল ;—আড়াই প্রহরে চাঁদ না ডোবা পর্যন্ত তাদের ফুর্তির আর কামাই নেই।

জ্যোৎস্না গিয়ে সব অন্ধকার হবার পর ক্রমশ সব যেন নিশুতি হয়ে এল।

রাখাল ভুতোকে ঠেলা দিয়ে বলে—এইবার!

ভুতো রাস্তায় ঝোপের ধারে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল—উঠে হাত তুলে বলে—কী!

রাখাল চাপা গলায় যতদূর সম্ভব খিঁচিয়ে ওঠে—কী তা জান না আহাম্মুক! এইবার যেতে হবে না!

ওঃ, তা হবে বটে!—ভুতো উঠে পড়ে কিন্তু কেমন যেন তার গা নেই। রাখালের সঙ্গে হোটেলখানার দিকে যেতে যেতে একবার বলেও ফেলে—আচ্ছা, আজ আর কষ্ট না করলে হয় না?

অ্যাঁ!—রাখাল যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। হল কী ভুতোর! ব্যাঙের জলে ব্যাজার! বেড়ালের মাছে অরুচি! মুখে বলে—বলিস কী ভুতো!

ভুতো যেন বড় লজ্জায় পড়ে যায়—না, এই বলছিলাম, ও হোটেলখানা তো আছেই, সোনার থালাও যাচ্ছে না। দু-চার দিন বাদে যখন খুশি সরালেই তো হত, ততদিন ঘুরেফিরে জায়গাটা একটু দেখে নিতাম। একবার পুঁটলি বাঁধলেই তো গা-ঢাকা দিতে হবে, আর দেখাশোনা তো হবে না।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে ফেলে ভুতো হাঁপাতে থাকে, রাখাল প্রথমে হতভম্ব তারপর তেতে আগুন হয়ে বলে,—তবে থাক তুই এইখানে, আমি একাই চললাম।

সিঁধকাঠিটা কেড়ে নিয়ে সে সত্যিই হনহন করে এগিয়ে চলে। ভুতোকে এবার পিছু নিতেই হয় ভয়ে ভয়ে। ধমক খাবার ভয়ে আর কথাটি পর্যন্ত কয় না।

হোটেলখানার ঠিক পেছন দিকটিতে তারা গিয়ে ওঠে। তারপর বেশ অন্ধকার ঘুপচি একটা কোণ দেখে কাজ শুরু করে দেয় রাখাল। গুণীর হাতে সিঁধকাঠি যেন মাখনের গায়ে ছুরির মতো চলে, দেখতে দেখতে পুরু দেওয়ালের অনেকখানি পাতলা হয়ে গেল।

রাখাল নিজের বাহাদুরিতে খুশী হয়ে ওঠে। ভুতোর ওপর রাগটা তার এতক্ষণে পড়ে এসেছে। তাকে ডেকে বলে,—আর কটা খোঁচা দিলেই একেবারে কাজ হাসিল। তুই ততক্ষণ একবার চারদিক ঘুরে দেখে আয় দেখি। কোথাও কেউ জেগে আছে কিনা!

রাখালের রাগ পড়েছে দেখে খুশী হয়ে ভুতো টহল দিতে বেরোয়। না, কোথাও কেউ জেগে নেই। কিন্তু চারিদিক ঘুরে হোটেলখানার সামনে এসে সে একেবারে অবাক!

হোটেলখানার দরজা তো হাট! কেউ বেরিয়েছে নাকি ভেতর থেকে! তাহলেই তো সর্বনাশ।

একেবারে নিঃসাড়ে সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। কারু কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে যায় রাখালের কাছে ব্যাপারটা জানাতে।

রাখাল তখন কাজ প্রায় হাসিল করে এনেছে। ভুতোকে দেখে খুশী হয়ে চুপিচুপি বলে—পা বাড়িয়ে দেখ দিকি ভুতো।

ভুতো সভয়ে বলে—পা বাড়াবে কী? হোটেলখানার দরজা খোলা তা জান!

দরজা খোলা! বলিস কিরে!

ভুতোর আর জবাব দেওয়া হয় না। তার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। তার ঠিক আগে রাখালের পেছনে একটা লোক কখন এসে দাঁড়িয়েছে সে টেরই পায় নি।

ভয়ে অবশ হাতপাগুলোর একটু সাড় ফিরতেই চোঁ চাঁ দৌড় দেবে,

না ভালোয় ভালোয় ধরা দেবে ভুতো যখন ঠিক করতে পারছে না, তখন লোকটা হঠাৎ বলে—বাঃ বাঃ, খুব হাতের কেরদানি তো! এই পাথরের মতো দেওয়ালে এমন নিটোল ফাঁক!—কিন্তু এ আবার কী খেলা ভাই? রাত দুপুরে দেওয়াল ফুটো?

খানিকক্ষণ আর কারও সাড়াশব্দ নেই। এখন হাতে হাতে ধরা পড়ার পর আর রক্ষা আছে! ভুতোর তো জিভটা অসাড়, পা দুটোর মনে হয় শেকড় গজিয়েছে।

সে ফ্যালফ্যাল করে তাকায় রাখালের দিকে। বিপদে রাখালই তার ভরসা। কিন্তু রাখালেরই কি আর মাথার ঠিক আছে।

সে যাকে বলে ভ্যাবাচ্যাকা অর্থাৎ সোজা ভাষায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

একবার সিঁধকাঠিটা শক্ত করে ধরে ভাবে; এক ঘা বসিয়ে দিয়েই সব ল্যাঠা দেবে চুকিয়ে। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হবে কি। ফ্যাসাদ বরং বাড়তেই পারে।

কিন্তু—কিন্তু ব্যাপারখানা কী।

লোকটার ধরন-ধারন দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো! কোথায় হৈ চৈ বাঁধিয়ে লোক ডেকে মারধর করে একটা কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড করে তুলবে, না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সিঁধের ফোকরটা পরীক্ষা করতেই ব্যস্ত।

আবার শুধোয় কিনা,—সত্যি ভাই, কী করছিলে বলো তো!

মনে মনে রাখাল এবার রীতিমত চটেই যায়। বাগে পেয়ে ঠাট্টা হচ্ছে—না! হাতে নাতে ধরে ফেলেছিস, যা করবার হয় কর। হাত-কড়া দে, না হয় দু ঘা কসিয়ে-ই দে লোকজন ডেকে। অমন দু-চার ঘা খাওয়া রাখালদের সওয়া আছে। কিন্তু ঠাট্টা আবার কিসের!

রাগে রাখালের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—কী আর করছিলাম, তোমাদের দেওয়াল কেমন মজবুত তাই দেখছিলাম।

লোকটা এক মুখ হেসে বলে,—ওঃ, তাই তো বটে! তোমরা বুঝি স্থাপত্য-বিশারদ?

স্থাপত্য-বিশারদ! ঠাট্টার পর আবার গালাগাল! তাও আবার এমন

দাঁতভাঙা গাল। রাখাল আগুন হয়ে উঠে বলে—কী?

না, না, আমি বলছি—লোকটা যেন একটু অপ্রতিভ হয়েই বলে,—তোমরা বুঝি বাড়িঘর কেমন মজবুত তদারক করে বেড়াও?

এ আর সত্যি সহ্য হয় না।

রাখাল জ্বলে উঠে বলে,—না।

না?—লোকটা অবাক—তবে?

তবে কী যেন জান না?—ন্যাকা আর কী?—রাখাল চেঁচিয়ে ওঠে,—আমরা চোর, হ্যাঁ সিঁধেল চোর, একশবার হাজারবার চোর,—এখন কী করবে করো!

লোকটা এবার হো হো করে হেসে ওঠে। হাসি তার আর থামতে চায় না। হাসতে হাসতেই বলে—বুঝেছি, বুঝেছি। তোমরা নির্ঘাত....

তাকে আর কথা শেষ করতে হয় না। রাখাল সিঁধকাঠিটা তুলে ধরে শাসিয়ে বলে,—খবরদার! আমরা হট্টমালার দেশের লোক, যদি ফের বলেছ তো দিয়েছি এক বাড়ি! এখানে নেমে অবধি শুধু হট্টমালা আর হট্টমালা-ই শুনছি। আর যদি কেউ বলেছে........রাখাল একেবারে মারমুখো।

লোকটা চুপ করে, কিন্তু হাসি তার থামে না। খানিক বাদে একটু সামলে বলে,—আচ্ছা ভাই, কিছু বলব না। এখন চলো ভেতরে তো যাই।

ভুতো এতক্ষণ এদের কথাবার্তায় কেমন যেন থই পাচ্ছিল না। এইবার ভাবগতিক দেখে সাহস করে রেগে উঠে বলে—যদি না যাই?

—না গেলে আর কী করছি বলো। তবে গেলে ভাল হত। আমাদের দিক্‌দারেরও এই এক রোগ কিনা! একসঙ্গেই চিকিচ্ছের ব্যবস্থা করা যেত।

চিকিচ্ছে! চিকিচ্ছে আবার কিসের! আর দিক্‌দারই বা কে! কথাগুলো যত গোলমেলেই হোক, রাখাল আর ভুতো ভেতরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে,—কারণ তাদের কথাবার্তার মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যে এসে জমা হয়ে গেছে। এদের হাত ছাড়িয়ে পালানোটা ঠিক সুবিধে হবে না।

ভেতরে যেতে যেতে ভুতো কিন্তু মনের ধুকফুকুনি আর চেপে রাখতে পারে

না। বলে,—দিক্‌দার আবার কে ?

একজন জবাব দেয়—আরে দিক্‌দারকে চেন না, বড় বাগানের সেরা গুণী। যার আপেলাম আর জাম্পিচ খেয়ে দেশের লোকের প্রাণ ঠাণ্ডা !

তার হয়েছে কী ?—জিজ্ঞেস করে রাখাল।

যা হয়েছে বড় সাংঘাতিক। এই সেদিন বড় মালীর নাকটা ফাটিয়ে দিলে না এক ঘুঁষিতে !

তাহলে বড় মালীর নাকের চিকিচ্ছে হচ্ছে বলো,—বলে রাখাল।

আহা, তার আবার চিকিচ্ছে কী ! একটু মলমেই ঠাণ্ডা। চিকিচ্ছে দরকার দিক্‌দারের !

নাক ফাটল বড় মালীর আর চিকিচ্ছে হবে দিক্‌দারের ? এরা বলে কী !—রাখাল সত্যি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

তা আর কার হবে ? কথায় কথায় লোকের গায়ে হাত তোলা—এ কি সোজা রোগ ! তোমাদেরও কিন্তু ওই এক ব্যায়রাম। আর একটু হলে দিয়েছিলে মাথাটা ফাটিয়ে ! তাই তো বলি, দিক্‌দারের সঙ্গে তোমাদের চিকিচ্ছে দরকার।

রাখালের মুখে আর কথা নেই। নিজের মাথাটা ঠিক আছে কিনা এবার তার ঘোরতর সন্দেহ হয়। ভুতোর কথা তো ধর্তব্যিই নয়। তার মাথা-ই নেই তো মাথা খারাপ।

খাবার দোকানে তারা ঢোকবার পর সেখানে রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। তারা চুরি করেছে, না তাজ্জব এক কেরামতি দেখিয়েছে, লোকগুলোর ভাবগতিক দেখে বোঝবার জো নেই।

দোকানের মালিক—আলবাত সে দোকানের মালিক—রীতিমত খাতির করেই তাদের এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসায় !

আরে এ যে চেনা মুখ—এই সকালেই না...........

তাকে আর কথাটা শেষ করতে দেয় না ভুতো।—হ্যাঁ, সকালেই এখানে খেয়ে গেছি। তা হয়েছে কী। দাম বঝি আর কেউ এখানে বাকী রাখে না।

যে লোকটা তাদের চুরি ধরে ফেলেছিল, সে দোকানীর কানে কানে কী যেন বলে।

দোকানী নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—ঠিক তো! বাকী থাকে বই কি। কিন্তু এবেলা তো ভাই সদর দিয়ে এলেই পারতে। কী দরকার ছিল অত কষ্ট করে দেওয়াল ফুটো করবার!

রাখাল হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে রেগে গিয়ে—ছিল, ছিল—দরকার ছিল। দরকার ছিল তোমার ওই সোনার থালাগুলো চুরি করা! সদর দিয়ে এলে সেগুলো দিতে তুমি?

দোকানী অবাক হয়ে বলে,—বাঃ, এ আর এমন কী কথা। থালাগুলো চাইলে কি আমি দিতাম না। কিন্তু কী করতে ভাই মিছিমিছি ওগুলো নিয়ে, শুধু বোঝা বওয়াই সার তো!

রাখাল আর ভুতো খানিক হতভম্ব হয়ে সকলের দিকে তাকায়। তারপর রাখাল হঠাৎ ভুতোর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—আর একবার আঙুলটায় কামড় দে দেখি ভুতো!

ভুতো খুশী মুখে দাঁত বার করতেই কিন্তু রাখাল হাতটা টেনে নিয়ে বলে,—আচ্ছা এখন থাক—একটু ভাবতে দে!

চার

ভুতো উদগ্রীব হয়ে, যাকে বলে দাঁত কষিয়ে বসে থাকে।

কিন্তু রাখালের আর হাত বাড়িয়ে কামড় খাবার তেমন উৎসাহ দেখা যায় না।

ভুতোকে রীতিমত হতাশ করে দোকানের মালিককে—আরে দোকানের মালিক নয় তো কে সে—রাখাল জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা বাপু, এই খাবারের দোকানটি যে সাজিয়ে বসে আছ,—কেন বলতে পার!

কেন, বাঃ, লোকে খাবে বলে।

লোকে খাবে বলে!—রাখাল একরকম দাঁত খিঁচিয়েই ওঠে—আহাম্মুক আর কাকে বলে। লোকে খাবে বলে তুমি দানছত্র খুলে ভূতের বেগার খেটে মরছ। যে-সে হট করে ঢুকছে, যা খুশি খেয়ে চলে যাচ্ছে, তোমায় তো কথাটি পর্যন্ত কইতে দেখলাম না। সোনা-রুপোর থালাবাটিগুলো পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে তুমি রাজী!

দোকানীর মুখ দিয়ে এবার আর কথাই বার হয় না, আর সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

ওষুধ বোধহয় ধরেছে! রাখাল রীতিমত বক্তৃতা শুরু করে দেয়—দুদিন দোকানটি আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে দেখো দিকি! সকলের আহ্লাদপনা আমি ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। এ ভালমানুষের কাল নয়, বুঝেছ বাবু,—ভালমানুষের আজকাল ভালই নেই। নিজের গণ্ডাটি না তুললে সবাই ঠকিয়ে যাবে।

উৎসাহের মাথায় রাখাল হয়তো আরো অনেক কিছু বলত, কিন্তু সবাই হঠাৎ হেসে ওঠে—তার অমন বক্তৃতাটা শুরুতেই মাটি করে দেয়।

হাসি! এত হাসি কিসের—রাখাল আবার মারমুখী হয়ে ওঠে।—ভাল কথা বললাম তা হেসেই উড়িয়ে দেওয়া হল, না! বলি এটা পাগলাগারদ না কী! একটা মানুষের মতো মানুষ এখানে নেই।

একজন হেসে বলে—কেন, আমরা কি মানুষ নই!

হ্যাঁ,—রাখাল অবজ্ঞাভরে বলে—তোমরা আবার মানুষ! মানুষের মতো চেহারা হলেই বুঝি মানুষ হয়। বলি, কী আছে তোমাদের? সবাই দাঁত বার করে হাসতেই জান। রাগের চোটে রাখালের মুখ দিয়ে যেন আপসোসের মতো বেরিয়ে যায়—এই যে রাতদুপুরে আমরা চুরি করতে এলাম, তা একটা পাহারাওলারও চুলের টিকি তো দেখা গেল না। হত আমাদের ওখানে তো এতক্ষণে দেখতে থানা পুলিশ দারোগা মিলে কী কাণ্ডটা বাধিয়ে তুলত।

থানা পুলিশ দারোগা!—লোকগুলো এবার সত্যি হতভম্ব হয়ে তাকায়। দোকানী তো—আলবাত সে দোকানী—জিজ্ঞেস করে,—দারোগা পুলিশ! সে আবার কী! কী করে তারা!

শোনো কথা!—রাখালকে এবার ভুতোকেই মুরুব্বি মানতে হয়—দারোগা পুলিশ কী করে জান না? ডাণ্ডা দিয়ে সবাইকে ঠাণ্ডা রাখে।

দোকানীকে ধরে এবার সে বোঝাবার চেষ্টা করে—এই ধরো তোমার এই দোকানটি যদি, কেউ লুট করতে চায়, তাহলে কে সামলাবে শুনি?

কে আবার লুট করতে চাইবে?

নাঃ, মাথা আর ঠাণ্ডা রাখা যায় না এতে, তবু রাখাল জোর করে নিজেকে সামলে বলে,—কে লুট করতে না চাইবে বলো,—এমন দোকান, এমন সব দামী দামী মাল—কার না লোভ হয় শুনি!

দোকানীর মুখ দেখে তবু মনে হয় ব্যাপারটা এখনও তার বোধগম্য হয় নি।

রাখাল আরো ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা করে। তার পাশের লোকটিকে দেখিয়ে বলে, এই ধরো—কী নাম তোমার হে বাপু!

দোকানী নিজে থেকে জানিয়ে দেয়,—আ রে, ওকে চেন না,—ও আমাদের তিনু কুমোর! ওর হাতের কাজ যদি........

থাক থাক—তোমার আর পরিচয় ব্যাখ্যান করতে হবে না—রাখাল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে,—এই তিনু কুমোরেরই যদি একদিন লোভ হয় তোমার দোকানটির ওপর।

বা রে, তা হবে কেন! ও তো কুমোর!

কুমোর বলতে আর ধর্মপুত্ত্র যুধিষ্ঠির নয় রে বাপু। মাটি ঘেঁটে ঘেঁটে অরুচি যদি ধরে একদিন—

দোকানী তার কথার মাঝখানে বলে ওঠে, তা আবার ধরে নাকি।

ধরে না!—রাখাল আবার খেঁকিয়ে ওঠে। ও চিরকাল কাদা ঘেঁটেই মরবে আর তুমি মজা করবে খাবারের দোকানে!

কী যে বল!—দোকানী এবার হেসে ওঠে—কাদা ঘেঁটে মজা পায় বলেই তো ও কুমোর! আর অরুচি ধরলে ওর খাবারের দোকানে বসতে কতক্ষণ!

রাখাল এবার হতাশভাবে চারিদিকে তাকায়। এ পাগলদের দেশে একটা কি মানুষের মতো মানুষ নেই গো।

তার প্রার্থনা পূরণ করতেই বুঝি সেই সময় দোকানে একটি অদ্ভুত চেহারার লোকের আবির্ভাব হয়।

লোকটার চেহারা যত না অদ্ভুত তার চেয়ে অপরূপ তার পোশাক। মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা কালো ডোরা-কাটা অদ্ভুত আলখাল্লা। গোঁফ-কামানো মুখে কাস্তের মতো বাঁকানো পাকানো দাড়ি।

লোকটা গম্ভীর মুখে এসে দোকানের একটা কোনে বসে। হাঁক দেয়—কে আছ, জলদি।

একজন পাশ থেকে রাখালের কানে কানে বলে,—ওই তোমাদের আর-এক জুড়িদার এসেছে।

আমাদের জুড়িদার!

হ্যাঁ গো, ওই তো আমাদের দিকদার, ফলবাগানের সেরা গুণী। বেশ ছিল বেচারা, কিন্তু নতুন ফলের চারা খুঁজতে সেই-যে নদীপারের জঙ্গলে গিয়ে পালাজ্বর ধরিয়ে আনল, তারপর থেকেই কেমন মাথাটা গেছে বিগড়ে। তোমাদের মতো যত আবোলতাবোল বকে। কিছু বলতে গেলেই মারমুখো।

বটে! রাখাল মনে মনে কী যেন একটা মতলব ভেঁজে বলে,—তোমাদের দিকদারের সঙ্গে একটু পরিচয় করতে হচ্ছে তো তাহলে!



আগে বলো, হেই দিকদার !

লোকগুলো হেসে উঠে বলে,—বেশ তো, করো না পরিচয়, তোমাদের মিলবে ভাল।

রাখাল আর বাক্যব্যয় না করে নিজে থেকে উঠে গিয়ে দিক্‌দারের কাছে দাঁড়ায়। তারপর অমায়িক-ভাবে হেসে বলে,—শুনছেন মশাই !

ভুরু কুঁচকে গোমড়া মুখে দিকদার রাখালের দিকে একবার তাকায়, তারপর মুখ ভেংচে বলে,—শুনছেন ! কী শুনব শুনি, যত সব ষাঁড়মার্কা উজবুক ! আগে বলো, হেই দিকদার !

রাখাল রীতিমত ভড়কে যায়।

দিকদার আবার ধমকে ওঠে,—কই, চুপ করে আছ যে ! বলো—হেই দিকদার !

রাখাল ভয়ে ভয়ে বলে—হেই দিকদার !

দিকদার বললে, কে রে তোরা ? কোত্থেকে এইচিস ? ইদিকে আয়, আমার সামনে এসে জবাব দে।

ওরা ভুঁইতরাসি গাঁয়ের কথা বললে। দিকদার একটু ভেবে আবার শুধোয়, কী কাজ জানিস তোরা ? করতিস কী ?

ভুতো রাখালের মুখের দিকে চায়। রাখাল বুক ফুলিয়ে বলে, করব আবার কী? চুরি করতাম। সিঁদেল চোর।

তাই শুনে দোকানের মধ্যে আর যারা বসে ছিল তারা সব উঠে এসে ওদের চার দিকে ভিড় করে দাঁড়াল। চুরি? সে আবার কী? কই সিঁদেল চোর? এ দুটোকে তো সাধারণ মানুষের মতন দেখা যাচ্ছে।

রাখাল খুব জাঁক করে বলে যেতে লাগল, চুরি করব না তো কি না খেয়ে মরব? ধরা যখন পড়েছি, তখন জেলও খেটেছি। কী বলতে চাও, বলো। আমরা কিছুকে ভয় পাই নে।

দিকদারই আগে কথা বলল,—ধমকে বলল, এখানে তোমাদের ওসবের সুবিধে নেই বলে রাখলাম।

এতক্ষণে ভুতো কথা বলল, পাশের লোকটিকে বলল, নেই আবার কী? ঐ তো হোটেলখানা থেকে গোছা গোছা তুলে নিয়ে গেলেই হল।

এইবারে শ্রোতারা যেন কথাটার মানে বুঝল। একজন খুশী হয়ে বললে, তাই বল! এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গাতে নিয়ে যাওয়াকে বুঝি চুরি বলে?

ভুতো বললে, ধেত। যার জিনিস তাকে না বলে নিতে হয়, না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নিতে হয়।

কেন? কেন?

কেন? নইলে সে দেবে কেন?

শুনে সবাই অবাক! কেন? দেবে না কেন? তোমার দরকার হলেও দেবে না?

রাখাল বললে, আহা, আমাদের দরকার বলে তো আর সব সময় নিচ্ছি নে; নিতে ইচ্ছে হচ্ছে বলেই নিচ্ছি।

তারা বললে, কী করবে নিয়ে? দরকার নেই তো নিয়ে করবে কী?

কেন, খাব-দাব সাজব বেড়াব, একটা ঘোড়া কিনব।

সে তো এমনিও করতে পার, তার জন্যে এক জায়গার জিনিস আর-এক জায়গায় নেবে কেন?

দিকদার উঠে পড়ে বললে, বুঝলে না, ওরা হট্টমালার দেশ থেকে এসেছে। চলো তো তোমরা আমার সঙ্গে, হয়তো কিছু সুবিধে করে দিতে পারি। কিন্তু খাটতে হবে বলে রাখলাম।

ভুতো অমনি লাফিয়ে উঠেছে। রাখাল তার কাছা ধরে টেনে বললে, কত মাইনে দেবে? ক ঘণ্টা খাটতে হবে?

ভিড়ের লোকের বিস্ময়ের সীমা নেই। তারা শুধোয়, মাইনে আবার কী?

রাখাল বিরক্ত হয়ে বলে, মাইনে কী জান না? মাগনা খাটব নাকি?

ততক্ষণে দিকদারের খাওয়া হয়ে গেছে। সেও উঠে পড়েছে। কর্কশ গলায় বললে, এখানে কেউ মাইনে-টাইনে পায় না, এ কি হট্টমালার দেশ পেয়েছ নাকি? আর 'কতক্ষণ খাটব' ও আবার কী কথা? যতক্ষণ পারবে খাটবে। পেট ভরে খেতে পাবে; বালিশ বিছানা পাবে—যেমন আর পাঁচ-জনে পায়; কাপড়চোপড় যা যা দরকার চেয়ে নেবে। চলো।

সবাই বললে, যাও যাও, দিকদারকে চটিও না। আর অমন বাগান তোমরা বাপের কালেও চোখে দেখ নি। একবার চোখ ভরে দেখে এসো গে।

শেষ পর্যন্ত গেল ওরা, একটা আস্তানা না হলে তো চলে না! আর এদের হাবভাব দেখে মনে হয় সবাই কাজ করে, এমনি এমনি হয়তো কেউ থাকতেই দেবে না।

ভিড় থেকে পাঁচ-সাত জনা ওদের সঙ্গ নিল, তারাও নাকি দিকদারের সঙ্গে ঐ বাগানের কাজ করে।

দিকদার হনহনিয়ে এগিয়ে চলল। কেমন যেন রাশভারী লোকটা—কাজের কথা ছাড়া মুখে দুটো ভালো কথা নেই।

খানিকটা এগিয়ে ভুতো তার পাশের লোকটাকে বললে, কেউ মাইনে পাও না তো চলে কী করে? ওরা না হয় থাকতে খেতে দিল, কাপড়-চোপড়ও দিল। আরো খরচ আছে তো।

সে তো অবাক! আরো খরচ মানে?

রাখাল এরকম বোকার মতন কথা শুনে রেগে গেল।—আরো খরচা থাকে

না মানুষের ? ধর একদিন বাইস্কোপ দেখবার শখ হল। তার জন্যে টিকিট কিনতে হবে না ?

লোকগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হেসে ফেলল,—বাইস্কোপ দেখতে আবার পয়সা লাগবে কেন ? গিয়ে বসে দেখে এলেই পারে। বাগানেই তো বাইস্কোপ আছে। ভুতো রাখাল সত্যি অবাক হয়ে গেল। এ দেশটা তো মন্দ না। ভুঁইতরাসির লোকরা যে শুধু গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে বাইস্কোপ দেখে তা নয়, তার ওপর কষ্ট করে সদরে গিয়ে তবে সে-না দেখতে হয় ! মন্দ নয় এ জায়গাটা।

তারা চার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। দিকদার এতদূরে এগিয়ে গেছে যে তাকে আর দেখা যায় না।

পাঁচ

আর তো দেরি করা চলে না, পায়ে পায়ে রাখাল ভুতো এগিয়ে যায়।

ফুটফুট করছে পরিষ্কার পথঘাট। ধারে ধারে বড় বড় গাছ। একটা কুয়োও রয়েছে মোড়ের মাথায়। তার কাছে একরাশি ডাব নিয়ে একটা বুড়ি বসে রয়েছে গাছের তলায়।

রাখাল জিগগেস করলে, ও বুড়ি মা, ডাব কত করে ?

বুড়ি একগাল হেসে বললে, যত খেতে পারবে তত করে পাবে। তবে শাঁস-টাঁস সব খেতে হবে। নষ্ট করতে পাবে না কিন্তু। খোলাগুলো হোথা ঢিপির মধ্যে ফেলো।

এ আবার কী গোলমেলে কথা। বুড়ির আস্পর্ধা তো কম নয়। ভুতো ওর কানে কানে বললে, রাগিস নে, বোধ হয় মিনি পয়সায় দিচ্ছে।

বাস্তবিক তাই। সবাই একটা করে ডাবের জল খেয়ে, শাঁস চেঁছে খেয়ে, আবার এগুতে লাগল। ভুতো মনে মনে ভাবলে, কী কাণ্ড দেখ! পয়সা লাগল না। এখানকার বড়লোকটি নিশ্চয়ই খুব দয়ালু, তাই এই রকম ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ওই বড়লোকটির সন্ধান নিতে হবে, হয়তো কিছু লাভ হতে পারে। মুখে জিগগেস করলে, এসব ডাবটাব কার ?

তারা তো অবাক! ডাব আবার কার হবে? ডাব তো গাছে ফলে, যত যত্ন করবে তত বেশি ফলবে। ওর আবার আমার তোমার কী ?

কিন্তু ওই বুড়িকে তো কিছু দিতে হয়!

কেন, বুড়িকে কিছু দেবে কেন ? ওর আবার কিসের দরকার ?

তা না হলে ও ডাব নিয়ে বসবে কেন ?—লোকগুলো হেসে উঠল—বসবে না ? বাঃ! ওই তো ওর কাজ। আহা, খেতে-টেতে হয় তো ওকে। ঘর চাই তো একটা ?

তা তো চাই-ই। ও তো বাগানবাড়ির সব চাইতে ভলো ঘরে থাকে। তার চাইতে ভালো ঘর আমাদের দেশেই নেই।

রাখাল ভুতোর কেমন যেন গোলমাল লাগছিল, কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস করতে বাধো-বাধোও ঠেকছিল। দেশটাকে আগে একটু পরখ করে নেওয়া দরকার, যে যা বলে অমনি মেনে নিলে চলবে কেন।

ততক্ষণে ওরা ছায়ায় ঘেরা মস্ত একটা বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। সে কী সব ফলের গাছ! থোলো থোলো পাকা ফল ঝুলছে। নধর চেহারার গোরুবাছুর এমনি ছাড়া রয়েছে। এক জায়গায় একপাল পাঁঠার ছানা নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে কেউ নেই। টপ করে একটা তুলে নিলেই বা কে জানছে?

ভুতো রাখালের কানে কানে বললে, নিয়ে কোনো লাভ নেই রে, কী করবি?

তাই তো, এ কথাটা তো রাখালের এতক্ষণ মনেই হয় নি, এখন এসব নিয়ে করবে কী? আগে একটা আস্তানা হোক নিজেদের। তারপর দেখা যাবে হট্টমালার লোকেরা ঠাট্টার পাত্র কিনা! হট্টমালা! শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়।

ছয়

ততক্ষণে বেলা বেড়ে উঠেছে। রাখাল ভুতোর ঘুম ঘুম পাচ্ছে। অভ্যেস তো নেই দিনে জাগবার, ওদের কাজ হয় রাত্তিরে। এমনি সময় একটা মস্ত বাড়ির সামনে ওরা এসে পৌঁছল।

এরকম বাড়ি রাখাল ভুতো চোখে দেখে নি কখনও। আগাগোড়া কাঠের তৈরী, বাড়ি ঘিরে চওড়া কাঠের বারান্দা, তার ধারে ধারে সে কী ফুলগাছের বাহার। তার গন্ধেই মন ভালো হয়ে যায়, চোখে দেখবারও দরকার করে না।

ভুতো আর থাকতে না পেরে পট করে একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে শুঁকতে লাগল। অমনি হাঁ-হাঁ করে একদল লোক ছুটে এল, যেন কত বড় অন্যায় করেছে।

ও কী করলে? ও কী করলে? মিছিমিছি ফুল ছিঁড়লে কেন?

ভুতো এমনি চমকে গেল যে জিভ কামড়ে ফেলল। তাড়াতাড়ি পথের মাঝখানে ফুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। অদ্ভুত সব লোক—সোনার থালা নিলে কিছু বলে না, অথচ সামান্য একটা ফুল নিয়েছে তো মহাভারত যেন অশুদ্ধ হয়ে গেছে! থাক গে বাবা, কী দরকার ফুল নিয়ে।

সঙ্গের লোকেরাও ব্যস্ত হয়ে উঠল। একজন ছুটে গিয়ে ফুলটা তুলে আবার ভুতোর হাতে গুঁজে দিল। ভাই, নষ্ট করবে ওটাকে? তাছাড়া পথটা নোংরা দেখাবে যে।

রাখাল খেঁকিয়ে বললে, ফুল ছেঁড়া যে তোমাদের দেশে বে-আইনী তা ও জানবে কী করে? আর ছিঁড়েই যখন ফেলেছে, তখন আবার নষ্ট হবে না তো কি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে হবে ওটাকে?

বারান্দায় একটু খাটো করে কাপড় পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল, সে হেসে বললে, কেন? নষ্ট করবে কেন ভাই? কানে গুঁজে রাখলেই তো হয়।

ন্যাকা। কানে গুঁজলে নষ্ট করা হল না? ওর থেকে কি ঘরে পয়সা আসে নাকি।

সে বললে, বাঃ রে! দেখতে তো ভালো লাগে, গন্ধ তো নাকে আসে। তবে আর নষ্ট হল কই? এ আবার কেমন কথা তোমার ভাই?

বলতেই সঙ্গীরা একসঙ্গে ফিসফিস করে বললে, ওরা যে হট্টমালার দেশ থেকে এসেছে।

ও, তাই বলো! আচ্ছা ভাই, এদিকে এসো তো আমাদের সঙ্গে।

চারদিকে লোক গিজগিজ করছে। তবে কি এটা একটা কাছারি নাকি? জমিদারের সেরেস্তা নয় তো? কিন্তু তাই যদি হবে তো জমিদার কই? নায়েব কই? মুহুরিরা কই? প্রজারা কই? রাখাল ভুতো অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে, তবে পাছে বে-ফাঁস কিছু বেরিয়ে যায় তাই মুখে কিছু বলে না।

ওরা বাড়িটার সামনে দিয়ে ঢুকে, পেছন দিয়ে বেরিয়ে এল। ছোট কাছারি, ওই একসারি ঘর, নায়েব গোমস্তা কাকেও দেখা গেল না। সবাই সাদা জামা কাপড়, একটু খাটো করে পরে, যে যার কাজ নিয়ে মেতে আছে।

মাঝখানে একটা বড় পুকুর, তার চারধারে বাগান, বাগানের ছাউনি আবার আগাগোড়া কাঁচ দিয়ে তৈরী, কয়েকটা ঘর রয়েছে। জমিদারের পয়সা আছে বলতে হবে। আশ্চর্য যে এতগুলো খাটো-কাপড়-পরা, খালি-পা লোক যেখানে ইচ্ছে যাওয়া আসা করছে, অথচ কেউ কিছু বলছেও না।

ওদের দেখে দিকদার একটা কাঁচের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বিরক্ত হয়ে বলল, এই এতক্ষণ বাদে আসা হল? নাও, নাও, এখন কাজে লেগে যাও সব। এইটুকু বলেই সে ফিরে যাচ্ছিল, রাখাল এগিয়ে এসে বলল, চলে যাচ্ছেন কি? আমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিন।

দিকদার বললে, কী জ্বালা! দেখেশুনে কাজ ঠিক করে নিতে পারবে না? রোসো, পুকুর সাফ করতে পারবে?

ওরা মাথা নাড়ে। ওরা চায় ঘরের কাজ। তার আগে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভালো। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল, দিনের বেলা কেউ ঘুমোয়

নাকি ? কিন্তু রাখাল যখন বুঝিয়ে বলল যে পরশু সারারাত নানান বিপদের মধ্যে কেটেছে, কাল রাতেও ঘুমোবার সুবিধে হয় নি, অমনি ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল, তা হলে চলো, একটু জিরিয়ে নেবে চলো। সত্যি তো, শরীর সুস্থ না হলে খাটবে কী করে। এসো আমার সঙ্গে।

নিয়ে গেল যেন নন্দনকাননের মধ্যে দিয়ে। নন্দনকানন অবিশ্যি ভুতো রাখাল চোখে দেখে নি, কিন্তু গত বছর দোলতলার মেলায় বর্ধমান থেকে শখের থিয়েটার এসেছিল, তারা কেমন উঁচু করে তক্তাপোশ বেঁধে তার পেছনে মস্ত নন্দনকাননের ছবি টানিয়েছিল। এ তার চাইতেও বড় আর অনেক বেশি সুন্দর ; তার জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া ছিল। তবে সেদিন রাখাল ভুতো বেশিক্ষণ থিয়েটার দেখে নি। গাঁয়ের লোক ঘর ছেড়ে থিয়েটার দেখছে যখন, সেই হল ভুতো রাখালের কাজের সময়। আজ এ বাগানটাকে প্রাণ ভরে দেখে নেওয়া গেল।

উঁচু করে বাঁধানো একটা জায়গা, মাথার ওপর কাঠের ছাদ, চারদিকে ফুল ফুটেছে। সঙ্গের লোকটি বললে, এখেনেও মাদুর পেতে জিরুতে পার। আবার ওই ঘরগুলোর যে কোনোটাতে শুতে পার, যেমন তোমাদের ইচ্ছে। আমি ভাই কাজে চললাম। খাবার সময় ডেকে নিয়ে যাব।

তাই তো চায় রাখাল, নিরিবিলি একটু ঘুরে দেখতে চায়। বললে, হ্যাখ ভুতো, বাইরে পাঁচজনের মধ্যে শুলে আমাদের সুবিধে হবে না। ঘরই ভালো, কী বলিস ?

ভুতো জবাব দেয় না কেন ? ফিরে তাকিয়ে দেখে কোনা থেকে একটা মাদুর নিয়ে সে শোবার ব্যবস্থা করছে।

তুই কি খেপলি, ভুতো ? এখন শুতে আছে ? আর হয়তো সারাদিনের মধ্যে নিরিবিলি পাবি নে। চল, ঘরগুলোতে তেমন কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখি।

ভুতো কিন্তু টান হয়ে মাদুরে শুয়ে পড়ে বললে, না রে, আমাদের কিছু রাখবার জায়গা-টায়গা নেই।

রাখাল নিজে একবার ঘুরেঘারে দেখল। সব ঘর খোলা, কোথাও

তালাবন্ধ কিছু নেই। ঘর বোঝাই নানান রঙের কাপড়-চোপড় তোরঙ্গে ভরা, কিন্তু তার তালা নেই। লেপ বালিশের পাহাড়। ঘটি, গামছা, তেল, সাবান, তাক ভরে মজুত রয়েছে। যেন বিরাট একটা সংসার, পথের ধারে খোলা রয়েছে, আগলাবার একটা লোক নেই।

মনটা কেমন খিঁচড়ে গেল রাখালের। ফিরে এসে ভুতোকে ঠেলা দিয়ে বললে, দেদার জিনিস। ভুঁইতরাসির বাজারে নিয়ে গিয়ে একবার ফেলতে পারলে, আর আমাদের কোনো ভাবনা থাকে না। কিন্তু নেব কী করে?

ভুতো বললে, উঁ? তাই তো বললাম। বলে পাশ ফিরে ঘুমুতে লাগল। রাখালই বা জেগে থেকে কী করে? আর একটা মাদুর টেনে ভুতোর পাশে শুয়ে পড়ল। সারা গায়ে ঝিরঝির করে বাতাস দিচ্ছে, দূরে দূরে পাখি ডাকছে, গাছপালার মধ্যে থেকে একটা শিরশির শব্দ আসছে, পেছনে থানার লোক লেগে নেই, আপনা থেকেই চোখ বুঁজে আসে। রাখাল হাত-পা মেলে ঘুমিয়ে পড়ল।

সাত

যে ওদের পোঁছে দিয়েছিল সেই ডেকে জাগিয়ে দিল। পুকুরে চান সেরে খাবার জায়গায় যাবার সময়, আর থাকতে না পেরে রাখাল শুধোয়, জিনিসপত্রের একটা গোছগাছ নেই তোমাদের ?

লোকটা ব্যস্ত হয়ে বললে, কেন, নোংরা জিনিস কিছু দেখলে নাকি ? তাহলে তো দিকদার আমাদের আস্ত রাখবে না।

না, না, তা বলছি নে। তবে অমন করে সব যে খুলে ফেলে রেখেছ, কেউ যদি নিয়ে যায় ?

কেন ? নেবে কেন ?

আহা, দরকার থাকলেও নেবে না ?

তা নিক না। সেই জন্যেই তো রাখা।

রাখাল বুঝল তার কথা লোকটা বোঝে নি। আবার বললে, দরকার না থাকলেও যদি কেউ নিয়ে যায় ?

পাগল নাকি ? কী করবে নিয়ে ?

কেন, বেচে ফেলে যদি ?

সে আবার কী ? এখানে তো বেচবার জায়গা-টায়গা নেই।

রাখালের একটু একটু রাগ হচ্ছিল, বললে, ধরো যদি রেগেমেগে আগুনই লাগিয়ে দিল। কিংবা কেটেকুটে নষ্ট করল। বলা তো যায় না।

সে চিন্তিত হয়ে বললে, না, না, সে যে বড় খারাপ কাজ। লোকে ওরকম করবে কেন ?

আরে, সবাই কি আর ভালো লোক। ধরো যদি ওরকম করেই, তাহলে তোমরা তার কী কর ? তাকে হাকিমের কাছে বেঁধে নিয়ে যাও না ?

লোকটার মুখ দেখে বোঝা গেল সে এর এক বর্ণেরও মানে বোঝে নি। গম্ভীর মুখ করে বললে, ওরকম করা ভারি খারাপ। তাহলে আমরা তার ভারি নিন্দে করব।

শুনে ভুতো রাখাল হেসেই কুটোপাটি। নিন্দে করবে তো ভারি বয়েই গেল। শুধোল, ব্যস! নিন্দে করেই ছেড়ে দেবে! তাকে ফাটকে দেওয়া হবে না? সে এত ক্ষতি করবে তাকে কিচ্ছুটি বলা হবে না?

লোকটি বললে, না, না, কিছু করা হবে না কে বললে? হবে বই কি। বাঃ, তার চিকিচ্ছে হবে তো।

চিকিচ্ছে? চিকিচ্ছে কেন? তার কি ব্যামো হয়েছে যে চিকিচ্ছে করা হবে?

লোকটি একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বলে,—হয় নি ব্যামো?—এই যে এসে গেলুম, কোথায় কী খেতে চাও, খাও গে।

ওরা দেখলে মেলা ছোট ছোট খাবারের দোকানের মতন, সেখানে বহু লোকের আনাগোনা। ভুতো মাথা চুলকে বললে, যা ইচ্ছে, খাব? এমনি খাব? কেউ কিছু চাইবে না তো?

তারা খুব হাসল। খিদে পেয়েছে তা চাট্টি খাবে না? তার জন্যে আবার কে কী চাইবে?

এ দেশের লোকগুলোর বুদ্ধি দেখে রাখাল ভুতো হাঁ। ভুতোর কানে কানে রাখাল বললে, বুঝলি, এ হল চোরের সগ্‌গ! এমনটি আর কোথাও পাবি নে রে। জিনিসপত্র হাট করে খোলা, থানা-গরাদের নাম শোনে নি কেউ, একটা দারোগা-টারোগা পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। তবে আর চাই কী? এখন জিনিসগুলো সরাবার একটা ব্যবস্থা কত্তে পাল্লেই আর আমাদের পায় কে! একবার দেশে গিয়ে পৌঁছুতে পাল্লেই হয়!

ভুতো বড় বড় গ্রাসে মাছভাত খেতে খেতে বললে, আবার সেখেনে ফিরে যাবি নাকি?

রাখাল আকাশ থেকে পড়ল, ফিরে যাবি নাকি মানে? ফিরে যাব না তো এত সব জিনিস নিয়ে করব কী?

ভুতো আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু দেশে গেলে হারু মোড়ল কি আর ছেড়ে দেবে? সঙ্গে সঙ্গে হাজতে ঠুসবে না?

সেও একটা কথা বটে। তার পরেই রাখাল মাথা নাড়া দিয়ে উঠল,

যাঃ তোর যেমন কথা! দারোগা ধরে শুধু তোকে আমাকে। বড়লোকদের বুঝি ধরে কখনও? তখন তো আমাদের মেলা টাকা হবে। ওই হারু মোড়লই এসে কত খোশামুদি করে দেখিস।

আর বেশি কথা বলা হল না, সবাই কাজে যাচ্ছে। সঙ্গে না গেলে আবার কোথায় সন্দেহ করবে শেষটা। ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকাই সব চাইতে ভালো।

দিকদারের স্বভাবটাই খিটখিটে। হঠাৎ এসে দেখা দিয়ে বলল, কী হে, এবার কিছু কাজ করবার মতলব থাকলে ঐ ছিদাম, ভজু ওদের সঙ্গে বাকশালের গাছ পাতলা করতে যাও না কেন?

বলেই তক্ষুনি চলে গেল, এরা গেল কি না গেল দেখল না পর্যন্ত। রাখালের হাসি পেল, ছিদামকে বললে, না গেলে ব্যাটা ঠিক জব্দ হয়। ছিদাম বললে, কেন? কিরকম জব্দ হয়? তুমি কাজ না করলে ও কী করে জব্দ হবে?

রাখালের কেমন জেদ চেপে গেল, বললে, বেশ যাব না, যাও। ভুতোর ইচ্ছে হয় যেতে পারে, আমি বেড়াতে চললাম। বলে গাছতলা দিয়ে রওনা দিল। ভুতো ছিদামকে জিগ্‌গেস করল, কাজ না করলে ওকে শাস্তি দেওয়া হবে না?

ছিদাম বললে, না। আসলে ওর চিকিচ্ছে দরকার। দাঁড়াও না, তারো ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু ভুতো আর দাড়াল না, পাঁই পাঁই করে ছুটে রাখালকে ধরে ফেলে বললে, ওরে অমন তড়পাস নি। ওরা তোর চিকিচ্ছে করবে বলছে। যদি আবার হাসপাতালে পোরে? যদি সুই দেয়?

হাসপাতাল শুনে রাখাল শিউরে উঠল।

তবে কি—তবে কি সেইরকম সাঁড়াশি দিয়ে আবার দাঁত তুলে দেবে নাকি? কাজেই ভুতো যেই বললে, কাজ কী, বরং চল, পাঠশালা না কী যেন বলল সেটা দেখেই আসি না। রাখাল কোনো আপত্তি না করে ওর সঙ্গে ফিরেই চলল। ভুতো শুধাল, হ্যাঁ রে, সেই ইঁট হাতে দাঁড়িয়ে রাখত গুরুমশাই তোকে, মনে আছে তোর?

রাখাল বললে, উঃফ্! তা আর মনে নেই! সেই যে গুরুমশাইয়ের ঠ্যাঙের ওপর ইঁটগুলো ফেলে চোঁ চাঁ দৌড় মারলাম, আর ওমুখো হই নি। কিন্তু কী ক্ষতিটা হল, তুই বল? আমি কি করে খাচ্ছি না? ভুতো একসঙ্গে অত কথা বলতে পারে না, তাই খালি বললে, যা বলেচিস্!

তুজনায় তো ফিরে এল। কিন্তু পাঠশালাটা আর খুঁজে পায় না। সেই বাগানই হোক কি বনই হোক, তারি মধ্যে ঘুরে ঘুরে তুজনে অবাক। গাছপালা যে এমন সুন্দর হতে পারে ওদের কোনো ধারণাই ছিল না।

একটা লাল কমলালেবুর মতন ফল একেবারে হাতের গোড়ায় ঝুলে রয়েছে। সেটিকে পেড়ে ছাড়িয়ে, এক কোয়া মুখে পুরে, ভুতোর মনে হল মধু! আর অবাক কাণ্ড, একটাও বীচি নেই। মুখ ফিরিয়ে যেই সে কথাটা রাখালকে বলতে যাবে, হঠাৎ দেখে একটা লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতে লোকটা, সাদা ধবধবে ধুতি পরা।

ভুতো অমনি কমলালেবু সুদ্ধ, হাতটা পেছনে লুকিয়ে ফেলল। বাবা! এখুনি হয়তো গর্দানই নেবে। একটা ফুল তুলেছিল বলে সবাই যা কাণ্ড লাগিয়েছিল!

কিন্তু লোকটা হেসে বললে, কেমন লাগল? এ হল দিকদার গুণমণির কেরামতি, এমন খেয়েছ কখনও? তারপর রাখালকে বলল, কই, তুমিও একটা খাও, খেয়ে বল দিকিনি আমি ঠিক বলেছি কি না! এই বাকশালের কমলামের জুড়ি ফল পাওয়া দায়। কমলাম বুঝলে তো? কমলালেবুর ডালে আমের কলম বসিয়ে, অনেক মেহনত করে তবে কমলাম ফলিয়েছে দিকদার, বললাম না ওরও জুড়ি নেই। তুঃখের বিষয় লোকটা ডাহা পাগল!

আট

রাখাল বললে—পাঠশালের পড়ুয়া কই, গুরুমশাই কই ?

লোকটা বলল—পাঠশালা নয়, বাক্‌শালা। এখানে আমরা মাসে দুবার করে, অমাবস্যায় আর পূর্ণিমায়, সবাই মিলে কথাবার্তা বলি। তাই বলি বাক্‌শাল। রাখাল ভুতো তো অবাক! এ আবার কী রকম আজব দেশ, যেখানে থানা নেই, জেলখানা নেই, অথচ কথা বলবার জন্যে খাসা এক বাগানওয়ালা বাড়ি করে রেখেছে। কেমন যেন খটকা লাগল ওদের ; রাখাল জিগগেস করল—কী কথাবার্তা বল তোমরা ?

সে বললে—যার যা ইচ্ছা, তবে একসঙ্গে পাঁচ মিনিটের বেশি কারও কথা বলবার নিয়ম নেই।

রাখাল বললে—নিয়ে যেতে পার আমাদেরও তোমাদের বাক্‌শালের সভায় একবার ?

সে হেসে বললে—নিয়ে যাবার কী আছে ? যার খুশি যেতে পারে। বেশ, আজ রাত্রে এসো আমার সঙ্গে। এখন চলো, গাছের নীচের ডাল কেটে পাতলা করে দেওয়া যাক, নইলে গোড়ায় রোদ পৌঁছবে না, বেশি ফুল ফুটবে না। ওই যে ছিদাম এসে গেছে।

দুজনের হাতে দুটি কাঁচি কাটারি দিয়ে সত্যি সত্যি তাদের কাজে লাগিয়ে দিল ছিদাম। পাঠশালা পালিয়ে সেই যে দুজনায় এক ছুতোর মিস্ত্রির দোকানে কাজ নিয়েছিল, তার পরে এতকাল বাদে এই প্রথম। রাখাল ভুতোর কানে কানে বললে—বেশি তক্ক করিস নে, যেমন যেমন বলে করে যাবি, আর চারদিকে চোখ রাখবি। আর দেখ, এই দা-কাঁচির ওজন দেখেছিস ? চার টাকা দরে বিকোয় এসব, এ যেন খবরদার হাতছাড়া করিস নে।

গন্ধরাজ ফুলের গাছের ডাল কুপোতে কুপোতে কেমন যেন বোকার মতো চেয়ে থাকে ভুতো, রাখালের ভাবনা হয়, আহাম্মুকটার গায়ে এদেশের

হাওয়া লেগে গেল নাকি ? তবেই তো মুশকিল, একা এত জিনিস আগলানো তো সম্ভব নয়। রাখালও কাজে লেগে যায়।

রোদ পড়ে এলে উস্কোখুস্কো চুল, সারাগায়ে ঘাম, মহা রেগেমেগে দিকদার এসে হাজির, ছিদামের যেন কোথায় গিয়ে তার বাঁধার কথা, সে বেমালুম ভুলে গেছে। যা নয় তাই বলে বকাবকি করে তাকে দিল পাঠিয়ে সেখানে, এখন রাত জেগে তার বাঁধুক হতভাগা। সারা জীবন রাখাল ভুতো গালাগালি শুনে, গালাগালি দিয়ে, আর গালাগালি খেয়ে এসেছে, তবু এই বাগানের মধ্যে অতগুলো কড়া কথা কেমন যেন ভুতোর বড় বিশ্রী লাগল।

দিকদার কিন্তু ছিদামকে ভাগিয়েই চলে যায় নি, একমনে এদের দুজনার কাজ দেখছিল। রাখাল একবার কাজ করতে করতে চোখ তুলতেই ইশারা করে তাকে কাছে ডাকল।

কী নাম তোমাদের ?

আজ্ঞে আমি রাখাল, ও ভুতো।

হট্টমালা থেকে আসছ বুঝি ?

আজ্ঞে না তো, আমরা ভুঁইতরাসির মানুষ।

ওই একই হল। তা কী কর তোমরা ?

কী বলবে ভেবে পায় না রাখাল, আমতা আমতা করতে থাকে। সত্যি কথাটা বলে ফেলে, এত বোকা সে নয়। দিকদার একটু বিরক্ত হয়েই বলল—একটা সোজা কথার জবাব দিতেই জিভ তালু জড়িয়ে যাচ্ছে ? এ পৃথিবীতে দুর্বল আর অকেজোদের কোনো জায়গা নেই, বুঝলে হে! যারা নিজেরা ভাবতে পারে না, তাদের চলতে হবে বুদ্ধিমানদের কথামতো আর যারা নিজেদের হাত চালাতে পারে না, তাদের হাত জোর করে চালিয়ে দিতে হবে।

রাখাল-ভুতোর কেমন ভয়-ভয় করতে থাকে। দিকদার কিন্তু আর রাগ দেখায় না, নরম গলায় বলে, কী, ফ্যালফ্যাল করে দেখছ কী ? জান, আমার কথামতো চললে তোমাদের কোন ভাবনা থাকবে না। নাও, নাও, এখন আবার

কাজে লেগে যাও দিকিনি। সব সমান সমান ভাগে আমি বিশ্বাস করি না, বুঝলে ? যে যত খাটবে তার তত ক্ষমতা হবে আর যার যত ক্ষমতা বাড়বে সুবিধেও তার ততই বেশি। কী বল হে, তোমরা ? আচ্ছা, এখন চলি, সুজ্যি ডুববার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও কাজের ছুটি। তারপর স্নান করে, খেয়ে দেয়ে আমার ফুলের ঘরে একবার এসো দিকি নি, তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।

দিকদার চলে যাবার পর ভুতো যেন কী রকম মুষড়ে পড়ল, কোনো কথা না বলে একমনে কাজ করতে লাগল। নাঃ, বোকাটাকে নিয়ে তো আর পারা গেল না ! এই তো কেমন ভাগ্যঠাকরুন হাতেনাতে সুবিধে করে দিচ্ছেন আর ভুতোটার কিনা হাঁড়িমুখ !

কী রে, তোর হল কী ? তোকে দেখলে যে গয়লার কলসিতেই দুধ সব দই হয়ে যাবে।

ভুতো কাঁচি নামিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে সূর্যদেব পাটে নেমেছেন, চারদিকে আলো কমে এসেছে। সে বললে—লোকটার কথাবার্তা আমার ভালো লাগে না। এমন খাসা জায়গা, এত ভালো খাওয়াদাওয়া আর ও কিনা ঘোঁট পাকাতে চায় !

রাখাল রেগে বলল—ঘোঁট ? ঘোঁট আবার কিসের ? কী অন্যায়টা বলল শুনি ? সবাই মিলে চারবেলা সমান খাবে সমান পরবে কেনই বা শুনি ? দিকদারের মতো একটা লোকও যা খাবে, ছিদামকে একটা কুলিমজুর বললেও চলে, ঘটে একদানা বিদ্যে নেই—ও-ও তাই খাবে ? বুদ্ধি করে যদি কেউ নিজের সুবিধে করে নেয় সেটা কি দোষ হল ?

ভুতো মাটিতে বসে পড়ে বলল—তাই বলে জোরজার করে—

রাখাল বললে—হ্যাঁরে, তোর কি মাথা খারাপ হল ? জোরজার না করে কে কবে বড়লোকটা হল শুনি ? তুই আমি না জানি লেখাপড়া, না আছে পয়সাকড়ি, এখন ওই দিকদারের কাছা ধরে ঝুলে পড়ে যদি কিছু করে নিতে পারি, তা হলে তোর আপত্তিটা কোথায় শুনি ? নে রাখ, এখন চল, এ আলোতে আর নিজের হাত দেখা যাচ্ছে না।

কোনো কথা না বলে ভুতোও খুন্তি, কাঁচি গুটিয়ে উঠে পড়ে। তারপর

পুকুরে নেমে ডুবজলে স্নান, আর মোটা মোটা লাল আটার রুটি দিয়ে ঝাল-ঝাল তরকারি আর বড় একঘটি মিষ্টি ঘন দুধ। রাখাল পর্যন্ত খুশী না হয়ে পারে না। বেড়ে ব্যবস্থা, যাই বলিস! জন্মে কখনও এত ভালো খাইদাই নি। এই ঝিরঝিরে বাতাসে গাছতলায় ঘুম দিতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু ঘুম দেওয়া আর হয় না, দিকদার লোক দিয়ে ডেকে পাঠায়। ভুতো যেতে নারাজ।—তোর ইচ্ছে হয় তুই যা, আমি এইখানে চাঁদের আলোয় বসে গা জিরোই। রাত নটায় ছিদামরা বাক্‌শালে নিয়ে যাবে বলেছে।

শুনে রাখালের হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। নাঃ, এ জায়গাটা খুব সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না, এর আগে সে যখন যা বলেছে ভুতো অম্লানবদনে সেইমতো কাজ করে গেছে, কোনো দিনও এতটুকু আপত্তির কথা তোলে নি, আর এখানে এসে দুদিন না যেতে ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়ার হাত পা খুর শিং নখ দাঁত সব দেখা দিচ্ছে। এমনি ওকে ছেড়ে দিলে কে জানে হয়তো পুলিশের খাতাতে গিয়ে নাম লিখিয়ে আসবে। তবে হ্যাঁ, এদেশে পুলিশ নেই এই রক্ষে। কর্কশ গলায় রাখাল বলল—ভালো চাস তো ওঠ, চল, কী বলে সে শুনে আসি। তারপর যেতে হয় বাক্‌শালে যাওয়া যাবে।

অনেকটা অভ্যাসবশতই ভুতো উঠে পড়ে শেষ অবধি রাখালের সঙ্গে হাঁটা দেয়। দিকদার ওদের দেরি দেখে মনে মনে হয়তো চটেছিল খুব, কিন্তু বোকা তো আর নয়, তাই বাইরে সেটা প্রকাশনা করে, খানিকটা বাঁকা হেসে বলল—কী, এখানকার হাবভাব কেমন তোমাদের হট্টমালার হট্টগোলের পর?

রাখাল বললে—আমরা মুখ্য মানুষ কত্তা, সেখেনেও খেটে খাই, এখেনেও খাব। হট্টগোলের ধার ধারি নে।

বরং নিরিবিলিতে কাজ সারতে পারলেই ভালো, কী বল হে?—এই বলে দিকদার আরেকটু বাঁকা হাসল। ভুতো অবাক হয়ে গিয়ে বলল,—নিরিবিলিতে না তো কি হাটের মাঝে কেউ চুরি করে নাকি?

দিকদার বলল,—ওইখানেই তোমাদের ভুল। চুরির কথা ভুলে যাও, চুরি বড় ছোট জিনিস, শুধু এইটুকু মনে রেখো যে জোর থাকলে হাটের মাঝেও যেমন ইচ্ছে কাজ করা যায়। তবে জোর থাকা চাই, তার মানে একা একা

কিছু হয় না। আমিও কিছু করতে পারব না আর তোমাদের মতো আকাট মুখ্যরা তো পারবেই না। তাই একটা দল বানাতে হবে, বুঝলে হে?

রাখাল বললে—সে আর এমন কী, ভুঁইতরাসিতেও তো সিঁদেলদের একটা বড় দল ছিল। তা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, এর নামে ও লাগাচ্ছে, ওর নামে এ লাগাচ্ছে, তাই এ ধরা পড়ল, ও ধরা পড়ল, শেষ পর্যন্ত গেল দল ভেঙে। এখন ভুতো আর আমি একসঙ্গে কাজ করি।

দিকদার একবার রাখালের দিকে, একবার ভুতোর দিকে তাকাল। তারপর ভুতোকে শুধোল—কী হে, তুমি যে চুপ মেরে গেলে? তোমারও কি সেই মত?

ভুতো যেন আকাশ থেকে পড়ে। কোন্ মতের কথা হচ্ছে? এখানে তো কারও খাবার কষ্ট নেই। দিকদার বিরক্ত হয়ে বলে—তোমার দেখছি শুধু খাই আর খাই! কেন, খাবার ছাড়া কি জিনিস নেই?

ভুতো একগাল হেসে বলে—তা হলে বোধহয় থেটারের কথা হচ্ছে? সেও খুব ভালো, কেমন প্যাঁ পোঁ বাজনার সঙ্গে পরীরা নাচে!

রাখাল এক ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে বললে—ওর জন্য ভাবনা করবেন না কত্তা, ওকে আমি ঠিক করে নেব। কিন্তু আপনার দলে ভিড়লে আমাদের ন্যায্য পাওনাটি পাব তো শেষ পর্যন্ত?

দূর থেকে ছিদাম-হারুদের চিৎকার শোনা যায়, তারা রাখাল-ভুতোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বাক্শালে সভা বসবে। দিকদার ফিসফিস করে বলল, যাও এখন, কিন্তু দেখো এসব কথা কাকপক্ষীও যেন টের না পায়, তাহলে কিন্তু তোমাদের সমূহ বিপদ। যাও এখন ভালমানুষ সেজে, তবে চোখ কান খোলা রেখো।

চমৎকার সভা হল, চাঁদের আলোয়, খোলা ঘাসজমিতে, কী যেন একটা ফুলের গন্ধে চারদিকটা ভুরভুর করছে। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখাল ভুতো চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। একজন দুজন করে দেখতে দেখতে মেলা লোকজন জড়ো হল, তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই মেয়ে। মাঝখানে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে সবাই গোল হয়ে বসেছে।

ফুটফুট করছে চাঁদের আলো, রাখাল ভুতো দেখলে সেই বিনি-পয়সায় ডাব বিক্রি করে বুড়ি, সেও এসেছে। তার গা-ভরা সোনার গয়না চাঁদের আলোতে ঝিকমিক করছে। দেখে দেখে ওদের চোখ ঝলসে যায়, হাত নিশপিশ করতে থাকে। ইস্‌, যদি খানকতক আলগোছে খুলে নেওয়া যেত! কিন্তু বুড়ি এত দামী জিনিস পেল কোত্থেকে, গিলটি নয় তো ?

যেমনি মনে ভাবা, রাখাল ছিদামকে শুধোল—বুড়ির গায়ে ও কি সত্যি সোনা ?

ছিদাম আশ্চর্য হয়ে বললে—সত্যি সোনার হবে না তো কিসের হবে ?

না, অত দামী জিনিস ও পেল কোত্থেকে ?

ছিদাম বললে—যেখান থেকে সবাই পায়, লাইব্রেরি থেকে।

লাইব্রেরি ? সে আবার কী ? ভুঁইতরাসির জমিদারবাবু মার নামে লাইব্রেরি করে দিয়েছেন শতদলবাসিনী স্মৃতি লাইব্রেরি, তা সেখানে তো শুধু বই থাকে। পাশেই একজন মোটামতো গিন্নি বসেছিলেন, বললেন—বইতে গয়নাতে তফাত কী শুনি ? কোথা থেকে এসেছ বাছা যে কিছুই জান না ?

ছিদাম কানে কানে কী বলাতে তিনি ভারি লজ্জা পেয়ে গেলেন—ও, হ্যাঁ, সে তো আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমাদের লাইব্রেরিতে বাছা, দেশের যত ভালো জিনিস রাখা থাকে। যার যা দরকার নাম লিখিয়ে নিতে পারে।

রাখাল বললে, টাকা দিতে হয় না তার জন্যে ? ভুঁইতরাসিতে মাসে দশ পয়সা দিতে হয়, তবে বই পড়তে দেয়।

লাইব্রেরিতে বই পড়বে, তার জন্যে আবার টাকা ? গিন্নি তো হাঁ, টাকা আবার কী ?

সঙ্গে একজন কমবয়সী মেয়ে ছিল, সে বললে—আহা দেখ নি মাসি, লাইব্রেরির কলা বিভাগে, সেই যে বিদেশ থেকে আনা সাদা সাদা গোল চাকতির গয়না, বোধহয় তার কথা বলছে ওরা। এতক্ষণে গিন্নি যেন কথাটা

বুঝলেন—ও, তাই বল। না বাবা, কিচ্ছু দিতে হয় না। কেউ কিছু ভালো জিনিস পেলে কিংবা তৈরি করলে তো এমনিই লাইব্রেরিতে দিয়ে দেয়, সবাই দেখবে, শুনবে, পড়বে ; ইচ্ছে হয় গায়ে দেবে।

এই বলে যেন ভারি একটা শক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেল এমনি ভাব করে গিন্নি হাত-পা গুটিয়ে বসলেন। এবার বোধহয় সভার কাজ শুরু হবে। রাখালের মাথায় কিন্তু লাইব্রেরির আজব কথাটাই শুধু ঘুরছে। না জিজ্ঞাসা করেও পারে না,—ধরো, বুড়ি গয়না ফেরত না দিয়ে পালাল ? শুনে সবাই অবাক! পালাবে ? কেন পালাবে কেন ?

বাঃ, গয়না বেশী পছন্দ হয়ে গেলে যদি নিজের কাছে রাখতে ইচ্ছে করে, কিংবা বেচে দিয়ে টাকা—

হঠাৎ মনে হয়ে গেল—টাকা কাকে বলে এরা জানে না, কাজেই কথাটা শেষ করা হল না।

ছিদাম বললে—স্-স্-স্, আর কথা নয়, গয়না পছন্দ হয় তো এক বছর দু বছরের জন্য লিখিয়ে নেওয়া যায়। না হারালেই হল লাইব্রেরির জিনিস।

রাখাল ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—তা অতই যদি দয়া তো লেখাবারই বা দরকারটা কী ? এমনি তুলে নিয়ে গেলেই তো হল।

ছিদাম রাখালের কানে কানে বলল—তাহলে লাইব্রেরির জিনিসপত্রের হিসেবের গোলমাল হয়ে যাবে যে।—এখন থামো দিকি নি, সভা আরম্ভ হয়ে গেল।

কিন্তু রাখাল সভার কথা শুনবে কী, তার মাথায় খালি ঘুরছে এদের লাইব্রেরিতে বোঝাই বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকবোঝাই সোনারুপোর চাই কি হীরেমণিমুক্তোর জিনিস সাজানো আছে, একবারটি কোনমতে বের করে আনতে পারলেই হল। তা ভুতোটার কাছ থেকে যে খুব বেশি সাহায্য পাওয়া যাবে তা তো মনে হয় না। এসব কথা হয়তো ওর কানেও যায় নি, ব্যাটা হাঁ করে সভার কথা শুনছে। দিকদার ঠিকই বলেছে—একটা ভালো দল না পাকালেই নয়।



ডাব ওয়ালী বুড়ি

ভুতো হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করে দেয়। শুনে রাখালের চুল দাড়ি খাড়া। যে ভুতো চারটে কথা একসঙ্গে গুছিয়ে বলতে পারে না, সে দিব্যি উঠে গিয়ে মাঝখানের গোল জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে বলছে কিনা, হ্যাঁ, নীচু জায়গা থেকে বাঁধ দিয়ে কেমন করে উঁচু জায়গায় জল তুলতে হয় সে আমি জানি। সেবার যখন দশ মাস কয়েদ খাটলাম, তখন আমরা তো এ-ই করতাম গো।

ভুতোটাকে কি ভূতে পেয়েছে যে হাটের মাঝখানে কয়েদ কয়েদ করে চ্যাঁচাচ্ছে! তারপর সবাই সাবধান হয়ে যাক আর কি, তখন লাইব্রেরিতে ঢোকাই এক ব্যাপার হবে, হয়তো চারগুনো পাহারা বসিয়ে দেবে, তখন ভুঁইতরাসির দাগী সিঁদেলেরও সাধ্য হবে না ভেতরে সেঁধোয়।

রেগেমেগে সভা ছেড়ে রাখাল বেরিয়ে পড়ে, মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু আচ্ছা পাগল তো এদেশের লোকরা, বইয়ের মতো করে সোনাদানা নাম লিখিয়ে বের করে দেয়। এ তো চোরের সগ্‌গ ছাড়া আর কিছু নয়, এমন সুযোগ ছেড়ে দেওয়া মহা-পাপ!

হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে রাখাল দেখে চাঁদের আলো মেখে গাছপালা টলটল করছে, দূরে দূরে একটা-দুটো ঘরবাড়ি, তাদের দরজা জানালা সব হাট করে খোলা। রাখাল বুঝল সে পথ হারিয়েছে।

নয়

পথ হারিয়েছে ঠিকই, কিন্তু দিকদার তো বলেই দিয়েছে চোখকান খোলা রাখতে, তবে আবার ভয়টা কিসের? রাখাল-সিঁদেল কাকে ভয় করে? হ্যাঃ! ন্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয়! তবে একবারটি লাইব্রেরির তাকগুলো চেঁছেপুঁছে নিলে পর তখন না হয় অন্য কথা। এখন সেসব জিনিস নিরাপদে দেশে নিয়ে যাওয়া নিয়েই যত ভাবনা। ছোটবেলা থেকে রাখাল দেখে এসেছে চারদিকে শুধু দুষ্টু লোকের ভিড়। একটা কানাকড়ি হাতিয়েছে কি অমনি চিল-ছোঁ মারবার জন্য সবাই মিলে চারদিকে ডানা ঝাপটাতে লেগে যাচ্ছে। ছিঃ! এখানেও এখন কপালে কী ভোগান্তি আছে কে জানে। তবে যদ্দূর দেখা যাচ্ছে, এখানকার কাণ্ডকারখানাই অন্যরকম। কোথায় ঘরে সিন্দুক ভরে সোনাদানা রেখে সজাগ হয়ে ঘুমুবে আর চোর এসে আপিমের ধুঁয়ো দিয়ে সবাইকে আরও অঘোরে ঘুম পাড়িয়ে সিন্দুক ভেঙে সর্বস্ব পাচার করবে, তা না, দরজা জানলা হাট করে খোলা রেখে সব বাক্‌শালে বক্তিমে করতে গেছেন!

হাসি পেতে লাগল রাখালের। এদের ঘরে যে এককণাও সোনা নেই এ বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহই নেই। ভুতো বলছিল এখানকার মেয়েরা নাকি ফুলের গয়না সবচেয়ে ভালবাসে, সোনার গয়না গায়ে পরা দেখলে বেশির ভাগ লোক নাকি মজা পায়। মিটিং-এ তো ডাব-ওয়ালী ছাড়া কেউ বড় একটা গয়না পরেছে বলে মনে হয় নি।

তাহলে এদের ঘর থেকে নেবে কী? খায় তো সব ক্যাণ্টিনে, ঘরে বোধ হয় কারও রাঁধাবাড়ার পাট নেই, বাসনকোসনই বা চুরি করবে কোথায়? নাঃ, লাইব্রেরিটাই সব। অন্যমনস্ক হয়ে চলতে চলতে হঠাৎ রাখালের খেয়াল হল সবাই তো বাক্‌শালে যায় নি, দুটো একটা ঘরে মিটমিট বাতি জলছে, দুটো একটা লোক এখানে ওখানে বসে চাঁদের আলো পোয়াচ্ছে।

বাস্তবিক এ দেশের চাঁদের আলোটা কিন্তু বেড়ে। পথের ধার থেকে একটা লোক ডেকে বলল—কী ভাই, কাকে খুঁজছ? তুমিই না সেই হট্টমালীদের একজন? রাখাল এগিয়ে গিয়ে তার পাশে মাটির ঢিপির ওপর বসে পড়ে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, তোমাদের দেশটি একটু ঘুরেফিরে দেখছি। বেড়ে আছ তোমরা, দরজা জানলা খুলে দিব্যি নিশ্চিন্দিমনে সব ঘুরছ! তা তুমি বাক্‌শালে গেলে না যে বড়?

লোকটা হেসে বলল, না হে, বোকাদের বকবকানির মতো বিরক্তিকর কিছু আছে নাকি? ওসব আমার ভালো লাগে না। সারাদিন লাইব্রেরিতে খাটি আর সন্ধ্যে হলেই স্নান করে খেয়ে দেয়ে বাইরে বসে গায়ে হাওয়া লাগাই। আমার নাম মোতিলাল।

মোতিলাল লাইব্রেরিতে কাজ করে শুনে রাখালের কানদুটো খাড়া হয়ে উঠল। ভালো লোকের সঙ্গেই মোলাকাত হয়ে গেল দেখা যাচ্ছে! তাকে জিগগেস করলে—কী আছে তোমাদের লাইবেরিতে? কী কাজ কর তোমরা?

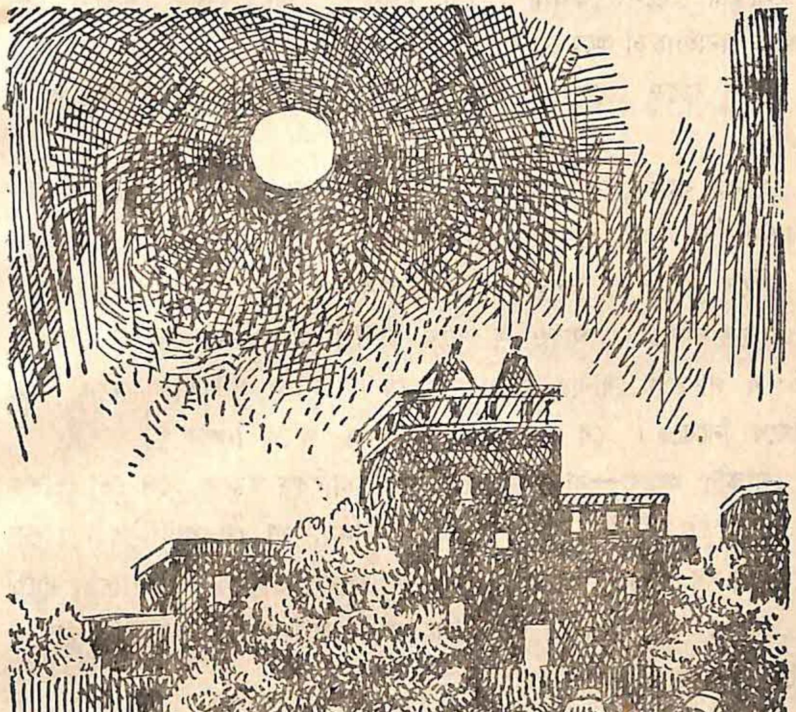
লোকটা তো অবাক। বাঃ! লাইব্রেরিতে কী থাকে জান না? দেশে যা কিছু ভালো জিনিস তৈরী হয় সব থাকে। বই, ছবি, ঘর সাজাবার জিনিস! কী চমৎকার সব ঘড়ি আছে, দেখে তাক লেগে যাবে তোমার। সব এখানে তৈরী; আবার বিদেশী জিনিসও আছে। তোমাদের হট্টমালার নকশা কাঁথা আছে।

রাখালের ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস পড়তে লাগল। বললে—আর কী আছে? লোকটা বললে—আরে, কত জিনিস আছে সে কি সব বলা যায়। কাল সকালে চলো, আমি তোমাকে সব দেখিয়ে দেব। আমাকে ছবি বিভাগে পাবে।

আমাকে ঢুকতে দেবে তো সেখানে?

ও-মা! কেন দেবে না? সবাই ঢুকে দেখবে বলেই তো রাখা। তাকে সব সারি সারি সাজানো।

রাখাল সাবধানে বলল—দামী জিনিস আছে না সব? সেও কি তাকের উপর খোলা পড়ে থাকে নাকি?



দুটো একটা লোক এখানে ওখানে বসে চাঁদের আলো পোয়াচ্ছে।

লোকটা হেসে ফেলল—পাগল নাকি। খোলা ফেলে রাখলে কে কোথায় টানাহ্যাঁচড়া করে কোনা ছিঁড়ে দিক আর কি!

কোনা ছিঁড়ে দেবে? রাখাল তো অবাক! কিসের আবার কোনা ছিঁড়বে?

লোকটা বললে, কেন, ওই সব দামী দামী এক হাজার দু হাজার বছরের পুরোনো ছবি, নকশা, পুঁথিপত্র, এই সবের।

বললে না দামী জিনিস? এখানকার যা কাণ্ড! পুঁথিপত্রের কথা কে জানতে চাইছে! আরও সাবধানে রাখাল বললে,—ডাবওয়ালী দেখলাম মিটিং-এ গা-ভরা সোনার গয়না পরেছে। নাকি লাইবেরি থেকে নাম লিখিয়ে নিয়েছে। সে সব তালাচাবি বন্ধ থাকে নিশ্চয়?

লোকটা বললে—না গো, না, ওসব চাবিবন্ধ করতে হলে তো দেশের সব চাবিতেও কুলোত না। সাধারণ জিনিস যা যে-কেউ তৈরী করতে পারে, সে সব খোলাই থাকে। শুধু যে জিনিস ভাঙলে আর পাওয়া যাবে না, সেগুলো বন্ধ থাকে। তবে কি জান, লাইব্রেরির কোনো জিনিস নষ্ট করলে বেদম সাজা দেওয়া হয়।

কী আবার বেদম সাজা? গারদ নেই, বেত নেই, দারোগা নেই।

লোকটা বললে—নিজের কাজ সেরে রোজ সন্ধ্যেবেলায় লাইব্রেরির কাজ করতে হয় রাত দশটা অবধি।

পাগলের দেশ নয় তো কী! ও আবার একটা শাস্তি হল নাকি! মুখে বললে রাখাল—রাত দশটা অবধি লাইবেরি খোলা থাকে?

তা থাকবে না? পড়ুয়ারা সব রাত জেগে না পড়লে যে তাদের ঘুম হয় না। তবে রাত দশটায় তাদের বের করে দিয়ে, ঘর বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সারারাত পাহারাওয়ালারা থাকে নিশ্চয়?

তা থাকে বৈ কি। নইলে পাগলগুলো আবার ঢুকে বই নিয়ে ঘাড় গুঁজে বসবে না ভেবেছ!

কজন পাহারাওয়ালা থাকে?

লোকটা অবাক হয়ে রাখালের মুখের দিকে চেয়ে বলল—কেন বল তো? এ বিষয়ে বই-টই লিখছ নাকি?

রাখাল মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে নিয়ে বলল—সত্যিই লিখব হয়তো। সব বিষয়ে জেনে রাখা ভালো।

লোকটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—তা সত্যি। দিকদারের সঙ্গে তোমাদের কোনো কথা হয়েছে নাকি?

অত বোকা নয় রাখাল। লোকটা হয়তো দিকদারের শত্রু। তাই বলল—কী নিয়ে কথা? খাওয়ার পর সে একবার ডেকে আমাদের দেশের কথা শুধোল বটে। তা দেখো, আমার একটা উব্‌গার করবে?

কী উপকার?

দিকদার আমাকে গাছ ছাঁটার কাজে লাগিয়েছে, ও আমার হাতে তেমন আসে না। তোমাদের লাইবেরিতে আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দাও না।

লোকটা খুব হাসল। আরে লাইব্রেরির কাজ যে শিখতে হয়, যে সে পারে না। তুমি বরং কাল সকালে একবার এসে দেখে যেও, তারপর ভালো লাগে তো কাজ শেখার ব্যবস্থা করে দেব। কেমন?

এদের কথাবার্তা শুনে ততক্ষণে আরেকটা লোকও এসে দাঁড়িয়েছিল। সে এবার কথা বলল।—তুমিই কি সেই পালানো হট্টমালী যাকে শহরময় আঁতিপাঁতি খোঁজা হচ্ছে?

কে খুঁজছে?—না তোমার সাগ্‌রেদের যে এতক্ষণ তোমাকে না দেখে নাড়ি ছেড়ে যাবার জোগাড়!

তাও ভালো। রাখালের তো ভয় হচ্ছিল যে ভুতোর গায়ে এদেশের হাওয়া লেগে সে এবার রাখালকে ছেড়ে ওদের দলে গিয়ে ভিড়বে। আঃ, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। একা একা কি কোন কাজ করা যায়। তবে একাই বা কেন? দিকদারের যে একটা দল আছে, যারা এখানকার সাধারণ লোকদের মতো নয়, সেটা রাখাল টের পেয়ে গেছে। অবিশ্যি, সাধারণদের মতো না হলেই যে রাখালের সঙ্গে মতে মিলবে, তাও খুব মনে হচ্ছে না।

তবু দেখা যাক, এদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যদি নিজের কাজ হাসিল করা যায়, তাই বা মন্দ কী? মন্দ হওয়া দূরে থাকুক, বরং ঢের ভালো, কারণ পয়সা-কড়ি সোনাদানার ওপর এদের এতটুকু নজর নেই, কাজেই ভাগ বসাতে আসবে না। শেষ নাগাড়ে মন্দ হবে না ভাগাভাগিটা।

ভুতো রাখালকে দেখে ছুটে এল—কোথায় গিছলি? আমি বলি বুঝি আবার কোথায় কী ফেঁদে ধরা পড়েছিস? ভুতোর হাত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রাখাল বললে, ধরবে কেটা শুনি? লাইবেরিতে একটা কাজের চেষ্টায় গিয়েছিলাম।

ভুতো এমনি অবাক হয়ে গেল যে তলার ঠোঁটটা আধ বিঘৎ ঝুলে পড়ল।—কেন, অত অবাক হবার কী আছে? আমি কি কোথাও কাজ গুছুতে জানি না ভেবেছিস?

এতক্ষণে যেন ব্যাপারটা বুঝল ভুতো। ব্যস্ত হয়ে কাছে এসে কানে কানে বলল—ওরে, গোলমালের মধ্যে যাস নি বলছি।

সাকরেদের যে ভারি সাহস হয়েছে, আবার পরামর্শ দিতে আসে! রাখাল বললে, কেন, ভয়টা কিসের শুনি? এরা আমাকে জেলে দেবে, না ফাঁসি দেবে?

ভুতো বলল,—না, ওসব এরা জানে না—কিন্তু ভারি নিন্দে করবে এটা ঠিক।

রাখাল হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। তেড়িয়া হয়ে উঠে বলল—আমি একটু কাজে লাগি সেটা যদি তোর ইচ্ছে না হয় তুই যেখানে খুশি চলে যেতে পারিস। মোট কথা, কাল সকালে আমি লাইবেরি দেখতে যাব।

রাখালের রাগ দেখে থতমত খেয়ে ভুতোর বিষম লেগেটেগে একাকার। তারপর খানিকটা সামলে নিয়ে বলল—আমিও যাব তোর সঙ্গে, কিন্তু পড়তে পারব না বলে রাখলাম।

কী জ্বালা! পড়াশুনো কত্তে আবার লাইবেরিতে যায় নাকি, তারচেয়ে গোঁফ চেঁচে আবার পাঠশালে গিয়ে ভর্তি হলেই হয়। কেমন হাঁটু বেঁকিয়ে দুই হাতে দুই থান ইট নিয়ে দাঁড়াবি আবার!

পরদিন সকালে ভুতো রাখালকে এক মুহূর্তও কাছছাড়া করে না। ভক্তির জন্যে না, পাছে রাখাল কিছু করে বসে স্রেফ এই ভয়ে, এটা রাখাল বেশ জানে। সকালে জলখাবার খেয়েই দিকদারের কাছে গিয়ে রাখাল দুজনার ছুটি করে নিল। দিকদার একটু মুচকি হেসে বলল,—বেশ তো, তা যাওগে লাইব্রেরিতে, দেখো গিয়ে কী সুবিধে করতে পার। কিন্তু দুপুরে খাওয়ার পর একবারটি দেখা কোরো আমার সঙ্গে। ভুতো পড়ে গেল মহা ফাঁপরে, গাছের কাজটিই তার ছিল পছন্দ, অথচ রাখালকে তো আর ছেড়ে যাওয়া যায় না।

মোতিলাল নিজে বেরিয়ে এসে ওদের লাইব্রেরিতে নিয়ে গেল, যেন কতই খাতিরের অতিথি। রাখাল ঢুকল বুক ফুলিয়ে, কিন্তু ভুতো কেবলি রাখালের পেছনে লুকোবার চেষ্টা করে। আধময়লা জামাকাপড় কেচেকুচে পরিষ্কার হয়ে এসেছে দুজনে, তবু এ জায়গাটা এত বেশি পরিষ্কার যে রাখালের দেখে দেখে বিরক্ত লাগে।

সামনের ঘরেই তাকের উপরে ভাল ভাল সোনারুপোর জিনিস।

দশ

আলগোছে তাকের ওপরে পড়ে আছে তাল-তাল সোনার বালা, তাগা, সাতনরী, আরও কত কি, মুকুট, হাঁসুলি—রাখালের কোঁকে কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে ভুতো একগাল হেসে বলে—মটুকটার বাহার দেখেছিস !

দেখে নি আবার ! তাকিয়ে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারে না, ওর একমুঠো নিয়ে ভুঁইতরাসির সোনাপটিতে একবার ফেলতে পারলে আর জীবনে কোনো দুঃখু থাকে না গো। কিন্তু চারদিকে লোকজন গিজগিজ করছে ; এর মধ্যে কোত্থেকে কী হবে ? হ্যাঁ, তবে যারা জিনিস নষ্ট করে তাদের নাকি ঘরদোর সাফ করার কাজে লাগিয়ে রাখা হয় সবাই চলে গেলে পরও, রাত দশটা অবধি, যতক্ষণ না পড়ুয়াদের ঠেলে বের করে দেওয়া হয়। মোতিলাল বলছিল।

কনুই দিয়ে তাকের ওপর থেকে একটা পুরোনো চীনেমাটির বাটি ফেলে দশখানা করে ভেঙে ফেলতে রাখালের একটুও দেরি হল না। আরে বাপ, অমনি হাঁই হাঁই করে গণ্ডা পাঁচেক লোকজন পাহারাদার ছুটে এসে মহা হল্লা লাগিয়ে দিল—যেন কী এক মহামূল্য জিনিস খোয়া গেছে। রাখালের হাসি পেল। এমন কি, মোতিলাল কেন, ভুতো পর্যন্ত রাগ দেখাতে লাগল।

রাখালও চটে গেল। হ্যাঁ, ভেঙেচি তো বেশ করেচি, ভারি তো এক চীনেমাটির বাটি ! নাকি হাজার হাজার বছরের পুরোনো বিদেশে কোথায় মাটি থেকে খুঁড়ে পাওয়া ! তাতে হয়েছে কী ? ভুঁইতরাসির হাটের দিনে মহাজনরা কাঁড়ি কাঁড়ি ওর চাইতে ঢের ভালো জিনিস ঢিবি করে ফেলে রাখে। রাখালের বে-আদবি দেখে সবাই অবাক।

যাই হোক, কাজ তো হাসিল হল। ম্যানেজারবাবু কানে কলম গুঁজে বেরিয়ে এসে গম্ভীর মুখে রাখালকে বললেন—আজ থেকে তিন দিন চারটে থেকে রাত দশটা অবধি সিঁড়ি মুছবে। এখন যেতে পার।

রাখাল তো তাই-ই চায়। অনেক কষ্টে হাসি লুকোল। কিন্তু ভুতো ?

সেও বলে—ও কাজ করলে, আমিও করব। অথচ বাইরে একটা স্যাঙাত না থাকলে পাচার করা হবে কেমন করে? সে যাই হোক গে, ভুতোর কথা শুনছে কে? এক যদি ভুতোও কিছু ভেঙে বসে। তবে তার আর সময় হল না। মোতিলাল তুজনকে কোনোরকমে দরজার বাইরে করে দিল। যাবার আগে রাখালকে চারটের সময় এসে আবার কাজে লাগতে হবে মনে করিয়ে দিল।

তুপুরে খাবার পর তুজনায় দিকদারের কাছে গেল। দিকদারের বড় কাজ, তার খাওয়াদাওয়াও হয় নি, চারদিকে লোকের ভিড়। তারা বিদায় হলে রাখাল-ভুতোকে কাছে ডেকে দিকদার তাদের সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল—তোমাদের মতলবখানা কী শুনি?

রাখাল যেন আকাশ থেকে পড়ল। মতলব? কিসের মতলব বাবু? গরিব মানুষ, খেটে খাই—

কর্কশ গলায় বাধা দিয়ে দিকদার বললে—খেটে খাও বটে, জেল খেটে খাও!

ভুতোর হাঁটু তুটো যেন ময়দার তৈরী বলে মনে হতে লাগল। দিকদার বললে, আমি লোক চিনি নে ভেবেছ? হট্টমালার লোক চিনতে আমার আর বাকি নেই। তারা কাজের জন্য কাজ করতে চায় এ আমি বিশ্বাস করি নে। বল্, হতভাগারা, কী তোদের মতলব!

এমনি চেঁচাতে লাগল দিকদার যে কাঠের বাড়ির কড়ি-বর্গা থেকে টুকরো টুকরো ছাল ভেঙে পড়তে লাগল। রাখাল ভুতো দেয়ালে ঠেস দিয়ে কোনোমতে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার থপ করে বসে পড়ে দিকদারের পা ধরে বলল, খেতে পাই নে বাবু!

পা সরিয়ে নিয়ে দিকদার বললে—খেতে পাস না তো তার ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্যেই তো ডেকেছি। আমার কথামতো চলিস তো আর তোদের কোনো ভাবনা থাকবে না, কিন্তু—রাখাল-ভুতোর চোখের ওপর চোখ রেখে নীচু গলায় দিকদার বললে—না চলিস যদি, কিংবা এ সব কথা ঘুণাক্ষরেও কাকেও বলিস যদি, তো সব ফাঁস করে দোব, হাটের মধ্যে হাঁড়ি

ভেঙে দোব—! ভালো চাস তো খুলে বল, ভুঁইতরাসি ছেড়ে কিসের আশায় এখানে এসেছিস?

রাখাল কেঁদে বললে—বাবু, বিশ্বাস করুন, আমরা ইচ্ছে করে আসি নি, কেমন যেন এসে পড়লাম। ফেরার পথটা বাতলে দিলে, কাল ভোরেই চলে যাব।

এখানে ভুতো একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। চোখ মুছে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমি যাব না।

রাখাল চটে কাঁই। যাবি না মানে? যাব না বললেই হল কিনা! কেমন না যাস দেখব!—বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকে, যদি শেষটা সত্যি না যায়! একটা স্যাঙাত না থাকলে তো মুশকিল! অমনি নরম গলায় বললে, আচ্ছা, সে দেখা যাবেখন। তোর বুড়ো মা না খেয়ে মলে আমি আর কী করতে পারি বল। ইচ্ছে না হয় যাস না। থাকুক বুড়ি একা পড়ে।

দিকদার বললে—খেঁচাখেচি রাখ্। আর দেখ্ ভুতো, এ জায়গাটাকে যত ভালো ভেবেছিস, মোটেই তা নয়। এখানে বোকাদের বড় বেশি প্রতিপত্তি। এখানে মুখ্যুরা বড় বেশি কথা বলে। দিকদারের পাশে নাক অবধি চাদর জড়িয়ে একটা লোক বসেছিল, সে এবার কথা বললে—সাবধান, দিকদার, তোমার মুখটাও বড় বেশি খুলে ফেলছ বাইরের লোকের কাছে।

দিকদার বিরক্ত হয়ে বলল, বাইরের লোক আবার কিসের? ওরা আমাদের সুবিধে করে দেবে, আমরা ওদের সুবিধে করে দেব। বাইরের লোক কাকে বলছ বুঝলাম না।

রাখাল তো হাঁ। বলে কী লোকটা? সোনারুপোগুলো কি শেষে বকরা হবে নাকি? তবেই তো মুশকিল! এক হাতে যা সরাবে সে আবার পাঁচ ভাগ হলে এক-একজনার থাকবে কতটুকু? দিকদার তার মুখের দিকে চেয়ে বলল—তোদের কোনো ভয় নেই, সোনাদানায় আমাদের লোভ নেই। আমরা শুধু চাই এ দেশটাকে চালাতে। বোকারা না

চালিয়ে আমাদের মতো বুদ্ধিমানরা চালালে কী মন্দটা হবে শুনি? কী, চুপ করে রইলি যে? তোদের মতটা বল্।

রাখাল ভুতো ভয়ে ভয়ে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ. তা তো বটেই।

দিকদার পাশের লোকটার দিকে ফিরে বলল—এদের কথা সব খাতায় লিখে রাখো, পরে যেন আবার অন্য রকম না বলে। রাখাল-ভুতোর হাত পা হিম, এ আবার কোন্ ফ্যাসাদে পড়া গেল। ভুতো রাখালের কানে কানে বলল, কাজ কি এদের ঘাঁটিয়ে; তার চেয়ে চল্, লম্বা দিই!

লম্বা দিতে তো রাখালেরও কম ইচ্ছে হচ্ছে না, কিন্তু এদেশ থেকে বেরুবার পথটা কে বলে দেবে? কই, ভুঁইতরাসির কেউ তো কখনো এখানকার কথা বলে নি। অথচ কতটুকুই বা দূর হতে পারে, ওরা নিজেরা তো এখানে ডুবল আর ওই ওখানে ড্যাঙা পেল। কতটুকু সময় বা পার হয়েছিল? ভাবলে কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে রাখালের। নাঃ, দিকদারকে চটানো যায় না, দেশে ফিরতে হলে তার সাহায্যের দরকার হবে। ভুতোটার যদি কোনো আক্কেল থাকে। দিকদার ওদের দুজনকে বসতে বলে ব্যাপারটাকে আরও খুলে বোঝাতে লাগল। এখানকার হালচাল বদলাতে হলে দু-চারটি এমন লোক চাই যাদের কেউ সন্দেহ করবে না! এখানকার লোকদের মধ্যে কার কী মতামত সকলেরই জানা, কাজেই বাইরের লোক আনতে হয়। কিন্তু বাইরের লোক পাচ্ছে কোথায়? কাজেই রাখাল-ভুতোকে দিয়েই কাজ সারাতে হয়। তার বদলে রাখাল-ভুতোর কী মনের ইচ্ছে সেটা জানালেই তার ব্যবস্থা করে দেবে দিকদার।

রাখাল বাস্তবিক অবাক হয়ে যায়, তাদের মনের ইচ্ছে তো একটাই হতে পারে। তবে তাতে আর দিকদারকে টানতে হবে না। ছোটবেলা থেকে রাখাল জানে দলে যত কম লোক থাকে ততই ভালো, কারণ জানাজানি, কানাকানি, ভাগাভাগি তা হলে ততই কম হবে। আটঘাট তো সব বাঁধাই হয়ে আছে, বাকি শুধু দেশে ফেরার ব্যবস্থা। সাতপাঁচ ভেবে দিকদারকে বললে, কাল আমাদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দিন।

শুনে দিকদার ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল।—সত্যিই কি তোমরা দেশে ফিরতে চাও? কিন্তু কেন? সেখানে গরিব লোকে খেতে পরতে পায় না, পুলিশে ধরে জেল খাটায়, তবু সেখানেই যেতে ইচ্ছে করে—এ তো ভারি আশ্চর্য কথা! সে যাই হোক, কথা যখন দিয়েছি, তখন যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে এখন।

নিজেদের আস্তানায় যাবার পথে ভুতো বললে—সোনার গয়না দিয়ে কী হবে রে? আসলে আমরা মরে গেছি, এটা হল সগ্‌গ। সগ্‌গ ছাড়া এমন ভালো জায়গা আর কী হতে পারে?

রাখাল বললে, হ্যাঁ, সগ্‌গ—চোরদের সগ্‌গ। অন্য কোনো সগ্‌গে তোকে আমাকে ঢুকতে দেবে না।

এগার

আস্তানায় পৌঁছবার অনেক আগেই সেই চাদর-জড়ানো রোগা লোকটি হনহনিয়ে এগিয়ে এসে ওদের ধরে ফেলে কোনো কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। ওদের তো হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল! লোকটা দুজনের মাঝখানে ঢুকে নীচু গলায় বললে, তাহলে এবার কী করা হবে?

রাখাল ভয়ের চোটে রেগে উঠল, আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবার কী দরকারটা আপনার মশায়?

লোকটা হাসল, কোন্‌টা তোমাদের ব্যাপার আর কোন্‌টা আমাদের, তাই নিয়েই গোল বাধছে। দুটোই যদি এক হত, তাহলেই ল্যাটা চুকে যেত।

রাখাল বললে, বাবু, আমরা পাঠশালা-পালানো মুখ্যু মানুষ, অত হেঁয়ালির মানে বুঝি নে, পষ্ট করে বলুন কী বলতে চান।

লোকটা খানিক চুপ করে থেকে খোলাখুলি বললে, তাহলে পষ্ট কথা হল এদেশের নিয়মকানুন পালটাতে আমাদের সাহায্য করো, তা হলে যা চাও তোমরা আমরা তাই দিয়ে দেব।

এতক্ষণে ভুতো ফিক করে হেসে ফেলল, ধ্যাত! তাই দেয় কেউ কখনো!

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, তোমাদের বুঝে ওঠা দায়। কেন, দেব না কেন? কী চাও তোমরা? মনের মতো কাজ চাও, এই তো? তা আর দেওয়া যাবে না কেন?

এবার রাখাল হো হো করে হেসে উঠে বলল, বেশ বলেছ বাবু, মনের মতো কাজ চাই! হি, হি।

কেন, অত হাসির কী আছে শুনি? এ কাজ ভালো লাগে না, ও কাজ চাই, এটা নয় সেটা। তোমরা এসে ইস্তক তো তাই শুনে আসছি। দিকদারও তো তাই বলল। এখন আবার মত বদলাবার কী হল বুঝলাম না।

অবাক হয়ে গিয়ে রাখাল ভুতো তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। লোকটা আরও বলে যেতে লাগল, তার বেশি আর কী চাইতে পার জানি না। হ্যাঁ, তবে উদয়াস্ত খাটতে না-ও ইচ্ছে হতে পারে, এত আইন মেনে চলতে না-ও চাইতে পার। রোসো না. একবার গদিতে আমরা চেপে বসি না, দেখো, তোমাদের কত সুবিধে করে দিই।

ভুতো বললে, কে সুবিধে করে দেবে? তুমি না তোমার দিকদার?

ভুতোটার কথা বলার আস্পর্ধা দেখে রাখাল চমকে গেল। তার গেঞ্জি ধরে টেনে বললে, বাবুর সঙ্গে ওরকম অছেদ্ধা করে কথা বলছিস কেন?

ভুতো বললে, কেন, তাতে কী হয়েছে, এদেশে তো সবাই সমান। গদি-ফদি আবার কী? সভায় শুনে এসেছি সবাই মিলে দেশ চালায়, তার মানে জমিদার-টমিদার নেই। তবে আবার অত ভয় কিসের?

এই বলে ভুতো একটু তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে নিল। রাখালের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ও কী, ভুতোটা খেপে গেল নাকি? ধমক দিয়ে বলল, ও কী হচ্ছে?

ভুতো বললে, আনন্দের চোটে একটু নেচে নিচ্ছি। তোদের হট্টমালায় তো আর আনন্দের চোটে নাচবার উপায় নেই. তাই এখানেই একটু নেচে নিচ্ছি। সেখান থেকে মাকে নিয়ে আসব ঠিক করেছি। মা-ও একটু আনন্দের মুখ দেখুক। হ্যাগো বাবু, আমাদের ভুঁইতরাসির পথটা বলে দেবেন? ব্যস আমি আর কিচ্ছুটি চাই না। সারাজীবন যেমন করে বলেন খেটে দেব, পয়সাকড়ি কিচ্ছু চাই না, লাইবেরির সোনাদানা রাখাল একাই নিক গে, ওতে আমার ম্-ম্-ম্—

আর কিছু বলা হল না ভুতোর, রাখাল দু হাতে ওর মুখ চেপে ধরল। সঙ্গের লোকটা ওদের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর বললে, ঠিক বুঝলাম না তোমাদের কথা। দিকদারকে কী বলব তাই ভেবে পাচ্ছি না।

রাখাল ততক্ষণে মরীয়া হয়ে উঠেছে। মুখ ভেংচে বলল, রাখো, ন্যাকামো রাখো, কিছুই বোঝ না, না? তবে শোনো, তোমাদের লাইবেরি ঘরে তাল

তাল সোনার গয়না দেখে এসেছি,সেই সব আমাদের দেশে পাচার করতে চাই। এখন কী বলবে বলো।

লোকটা যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাথা নাড়তে লাগল, এত জিনিস থাকতে, এত সুবিধে থাকতে, ওইগুলোর উপর লোভ? আশ্চর্য তো! আচ্ছা, কী করতে হবে বললেই করে দেব, তার আগে আমাদের কাজটি করে দিতে হবে কিন্তু।

রাখাল ভারি সেয়ানা, নইলে এতকাল একা হাতে আর করে খেতে হত না। এই শেষ বারও হয়তো ভুতোটা সঙ্গে না থাকলে ধরা পড়ত না। সে তাই বললে, কিচ্ছু করতে হবে না বাবু, শুধু ভুঁইতরাসি ফেরার পথটা বাতলিয়ে দিন আর কারও কাছে কিছু যেন ফাঁস করে দেবেন না।

লোকটা ভাবিত হয়ে বললে, আমি পথ বাতলাব কী করে? ভুঁইতরাসির নামই শুনি নি কখনও। তবে দিকদার গাছগাছড়ার সন্ধানে ইদিক উদিক যায় অবিশ্যি, ওর জানা থাকতে পারে। গাছের খোঁজে বনে বনে ঘুরেই তো সেই যে জ্বর পাকড়ে আনল, সেই থেকে ও অন্যরকম হয়ে গেল। এখন আমাদের ক-জনাকে নিয়ে দল পাকাচ্ছে। আরও লোক জড়ো করা দরকার। তোমরা এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পার।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে রাখাল, ওর কথার অর্ধেকের বেশি বোঝে না। তবু বলে, অতশত বুঝি নে বাবু, কী করতে হবে সেইটুকু বলে দাও. আমি করে দেব। তবে সইটই দিতে পারব না। টিপসই দিতে আমার ওস্তাদের বারণ ছিল।

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলে, কে আবার তোমার ওস্তাদ?

রাখাল ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তাই দিয়ে তোমার কী হবে বাবু, সে কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। নাও, এখন কী করতে হবে বলো। তার বদলে কিন্তু আমাদের দেশের পথটি দেখিয়ে দিতে হবে, নৌকো ঠিক করে দিতে হবে।

লোকটা বললে, নৌকো করে যেতে হয় বুঝি সেখানে? বেশ তো মজা।

মজাটজা রাখো বাবু, কী করতে হবে বলো।

কিছুই না, শুধু চাদরের মধ্যে করে এই কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে যাবে আর লাইব্রেরির ভিড় কমে গেলে এখানে ওখানে একটা করে এমনভাবে সাজিয়ে রাখবে যাতে যে সেখানে বসবে তারই চোখে পড়বে।

তারপর ভুতোর দিকে ফিরে বললে, আর তুমি বাইরের কাজ করবে, এখানে ওখানে গাছের ডালে, নৌকোঘাটে, যেখানেই ফাঁকা দেখবে একটা কাগজ এই পিন দিয়ে আটকে দেবে। নাও, ধরো।

ভুতো হাত বাড়ায় না দেখে লোকটা একটু যেন ঘাবড়ে গেল। রাখালকে শুধোল, বলি ওহে. তোমার এই স্যাঙাতটি যেন কেমনতর, ওকে বিশ্বাস করা যাবে তো ?

রাখাল ভুতোর দিকে রুখে দাঁড়িয়ে বলল, খবরদার ভুতো, কেঁইচিপনা করেছিস কি মরেছিস। আমি পয়সা কড়ি নিয়ে একাই চলে যাব ভুঁইতরাসি, তারপর তোর বুড়িমার কী হয় দেখিস।

ভুতোর তাই শুনে নাড়ি ছেড়ে যাবার যোগাড়, ওরে আমি কি তাই বলেছি নাকি ? দিকদারের ব্যাপারে আমার কী, আমাকে যেটুকু করতে বলবে করে দোব, তারপর ভুঁইতরাসি গিয়ে মাকে আনব। তা হলেই হল তো ? আরে এ যে আমাদের গাঁয়ের থিয়েটার পার্টির লোটিসের মতো। কিন্তু আমাদের তো চাদর নেই, সবাই দেখে ফেলবে যে ?

লোকটি হেসে বললে, অত কাঁচা কাজ দিকদারের নয়। বলে চাদরের মধ্যে থেকে দুটি দিব্যি নতুন জোলার উড়ুনি বের করে দুজনার গায়ে জড়িয়ে দিল। তারপর নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে জানিয়ে দিল এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলতে হবে না।

লোকটা চলে গেল, ভুতো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, কী জানি, মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। ওগুলো বিলি করলে কোন অন্যায় কাজ হবে না তো ?

রাখাল বললে, দূর, তোর যেমন কথা। ছাপার লেখা দেখতে পাচ্ছিস নে ? ও কখনো মন্দ হয় না।

তাই হবে হয়তো। পথঘাট নিঝুম, কেউ কোথাও নেই, নিরিবিলি

জায়গা দেখে রাখাল-ভুতো ছোট ছোট হ্যাণ্ডবিলের গোছা দুটিকে নিজেদের কোঁচড়ের কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে নিল, বাইরে থেকে কিছু মালুম দিল না। রাখালের একটু হাসিও পেল এই ভেবে যে এই কাগজের কুচি দিয়ে নাকি দিকদার এখানকার নিয়ম পালটাবে। নির্ঘাত পাগল! আরে সেবার দাঙ্গার সময়, জমিদারবাবুর শালা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে লেঠেল ঠ্যাঙাড়ে ভাড়া করেও কিছু করতে পারল না, মাঝখান থেকে নিজেই দেশছাড়া হয়ে রইল। আর দিকদার মনে ভেবেছে কী।

দেশের জন্যে রাখালের মন কেমন করে, অথচ এ জায়গাটা সত্যিই চোরদের জন্যই তৈরী, নইলে পুরোনো কোনা-ছেঁড়া পুঁথিপত্র আলমারিতে বন্ধ করে, সোনাদানাগুলোকে বাইরে ফেলে রাখবে কেন? আসলে এখানে যে ওসবের এক কানা কড়িও দাম নেই এ কথা রাখালের বুঝতে বাকি নেই, ওগুলোর দাম পেতে হলে ভুঁইতরাসিতে না গিয়ে সোনাগঞ্জে যাওয়া দরকার। ভুঁইতরাসিতে ওসব নিয়ে পা দিয়েছে কি আবার ধরে নিয়ে যাবে থানায়। সোনাগঞ্জের সুখেন পোদ্দার এর আগে রাখালের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনেছে। বাজার দরের চেয়ে দাম একটু কম পাওয়া গেলেও, একেবারে নিরাপদ নিশ্চিন্ত হয়ে জিনিসগুলো পাচার করা যাবে। হাজার হাজার কাঁচা টাকা বের করে দিতে পারে সুখেন এক কথায়।

এইসব ভাবতে ভাবতে তিনভাগ পথ পেরিয়ে এসেছে, হঠাৎ খেয়াল হল ভুতোর মুখে কথা নেই। তার মানে কী? কেমন একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। কাজ কী ওকে জড়িয়ে, কী ফ্যাসাদে ফেলবে কে জানে। অমনি তার দিকে ফিরে বলল, দেখ ভুতো, তোর আর কাগজ বিলি করে কাজ নেই। যার যা কাজ। তুই ভালো করে অ-আই চিনলি নে, কাগজের তুই কী বুঝবি। ও যা করবার আমিই করব এখন। তুই বরং জিনিসগুলো পাচার করতে আমাকে সাহায্য করিস।

ভুতো ভারি খুশী হয়ে উঠল প্রথমটা, তারপর আবার হাঁড়িমুখ করে বলল,—ওসব ঘেন্নার জিনিসে তুই আর হাত দিস নে রাখাল। দেখলি না—ডাবওয়ালি ছাড়া কেউ ওসব ছোঁয়ও না।

রাখাল তেড়িয়া হয়ে উঠল, তুই থাম দিকিনি, এই ঘেন্নার জিনিস বেচেই ভুঁইতরাসিতে তোর মার জন্যে দুধ ঘি কেনা হবে। আর লোক হাসাস নি।

এ কথার ওপর আর বলবার মতো কিছু ভেবে পায় না ভুতো। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, তবে—তবে কি আজই সরাবি নাকি?

রাখাল রেগে যায়। ভুতোটার কী বুদ্ধি! চটপট চম্পট দেবার একটা ব্যবস্থা না করে সরালেই হয়েছে আর কী। যা কিছু শিখেছিল হতভাগা এই পোড়ার দেশে এসে সব ভুলে বসে আছে। মুখে শুধু এইটুকু বললে রাখাল, কী যে বলিস! জায়গা দেখতে হবে না! বেরুবার পথ খোলতাই করতে হবে না! জিনিস বাছাই করতে হবে না! নইলে শেষটা হাতে হাতকড়া—বলতে বলতে মনে পড়ল এদেশে হাতকড়াও নেই, থানা-দারোগা-জজ-হাকিম কেউ নেই, অন্যায় করলে এরা নাকি শুধু খুব নিন্দে করে! তাও ধরা পড়লে তবে তো। তা ধরা পড়ছে কে? চারদিন সিঁড়ি মুছতে হবে, তার মধ্যে তিন দিনই কাটবে মতলব পাকা করতে, শেষ দিনে কাজ হাসিল। ততদিনে দিকদারের সব কাগজপত্র বিলি হয়ে যাবে, দেশে যাবার একটা ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। আহা, ভুঁইতরাসি বড় ভালো জায়গা, ঘাটের ধারে এঁটো বাসন মাজতে নামলেই, ভাতের গন্ধে এই বড় বড় রুই কাতলা ভেসে আসে গো!

মনটা কেমন করতে থাকে, এখান থেকে এক ঝাঁকা সোনাদানা নিয়ে যেতে পারলে সারা জীবন আর কোন দুঃখু থাকবে না। আর চুরিচামারি—ও করতে হবে না, জেলখানাতেও যেতে হবে না। ভুঁইতরাসির মাঠগুলো কী সবুজ, পুকুরের জল কী মিঠে, জেলে বন্ধ থাকলে সে সবের স্বাদ পাবে কী করে? নাঃ, এই শেষ, এর পর আর চুরি করবে না রাখাল, জমিজমা কিনে চাষবাস করে খাবে। ভুতো যে একেবারেই বাজে কথা বলে তা নয়।

ততক্ষনে চারটে বেজেছে, লাইব্রেরির ফটকে এসে পৌঁছেছে ওরা। ভুতো বললে, আমি গাছ ছাঁটাই করতে গেলাম, কখন কী করতে হবে বলিস।

এই বলেই হন হন করে হাঁটা দিল, একবারও ফিরে তাকাল না, যেন পেছনে বাঘ লেগেছে ! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাখাল ভাবল,—এও দেখতে হল, ছোটবেলাকার বন্ধুও তার কাছ থেকে পালাতে পেরে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচছে !

বারো

লাইব্রেরির সিঁড়ি মোছার একেকটা দিন যেন একেকটা যুগ। রোজ বেলা চারটের সময় হাজির হয় রাখাল, মোতিলাল ভুরু কুঁচকে তাকে বালতি ঝাড়ন দিয়ে দেয়, তারপর মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। সে যে তার উপর কত বিরক্ত এই থেকে রাখাল যথেষ্ট বুঝতে পারে। অথচ কী এমন দোষটা করেছে সে! একটা পুরোনো ফাটলধরা চিনেমাটির বাটি ভেঙেছে বই তো নয়! মোতিলালকে সে বন্ধু ঠাউরেছিল, তারই কথায় লাইব্রেরিতে ঢুকতে পেরেছিল আর এখন সে তার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাকুক, মুখের দিকে তাকায় না পর্যন্ত! মনের দুঃখে রাখাল জোরে জোরে সিঁড়ি মুছতে থাকে। এত ভালো করে মোছে যে রাতের ডিউটির দু' নম্বর ম্যানেজার বাবু পর্যন্ত তার তারিফ করতে থাকেন। বলেন—বাঃ, খাশা কাজের হাত তো তোমার! বল তো তোমাকে এই কাজেই বরাবরের মতো বহাল করি।

রাখাল মাথা নীচু করে কাজ করে যায়, মুখে কিছু বলে না। কোঁকে গোঁজা সেই কাগজগুলো গায়ে ফোটে। মনে মনে ভাবে—সিঁড়ি মোছার কাজে বহাল হতে তার বয়ে গেছে, ভুঁইতরাসি ফিরে গিয়ে সে একটা রাজা হবে। তবে এখন তিন দিন ভালোমানুষের মতো কাজ করে যাব, শেষের দিন কাগজগুলোকে লাইব্রেরির সব টেবিলে সাজিয়ে, কাগজবাঁধা ন্যাকড়াতে গয়নাগুলো পুঁটলি করে বেঁধে নিয়ে একেবারে লম্বা দেবে। যাবার সময় বাকি কাগজও পথের ধারে ছড়িয়ে ফেলে যাবে।

মুশকিল শুধু দেশে ফেরার কী ব্যবস্থা হল দিকদার সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলে না। আর ভুতো একেবারে কথা বলা ছেড়েই দিয়েছে। রাত দশটায় কাজ সেরে আস্তানায় ফিরে ভুতোর পাশে শুয়ে যখন তার

কানে কানে একশো কথা বলে রাখাল, ভুতো চুপ করে থাকে। রেগে খোঁচা দিলে বলে—হুম্! রাখালের মন খারাপ হয়ে যায়।

বাস্তবিক এ দেশটা অদ্ভুত। লাইব্রেরিতে আর যারা রাখালের সঙ্গে সিঁড়ি মোছে, তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। অদ্ভুত সব কথা বলে তারা। এদেশে নাকি কেউ কাউকে মারধোর করে না, বাপরাও দুষ্টু ছেলেদের মারে না, পাঠশালের গুরুমশাইদের হাতেও বেত থাকে না। তবে কি এ দেশে দুষ্টু ছেলে নেই? লোকগুলো অবাক হয়ে বলে, তাই কখনো হয়? দুষ্টু ছেলে থাকবে না—তাই কখনো সম্ভব? তাদের সায়েস্তা করা হয় কী করে তা হলে?—কেন, কেউ তাদের সঙ্গে মেশে না, বাপ-মারা তাদের সঙ্গে কথা বলেন না, শেষ পর্যন্ত বাছাধনরা বাধ্য হয়ে ভালো হন। অবিশ্যি দুরন্তপনাকে এরা দুষ্টুমি বলে না। এদের ছেলেরা ইচ্ছেমতো গাছে চড়ে, জলে সাঁতরায়, মাঠে মাঠে দৌড়ঝাঁপ করে। সবচেয়ে দুরন্ত ছেলেরাই সবচেয়ে ভালো চাষের কাজ করে।

শুনতে শুনতে কেমন মন কেমন করতে থাকে রাখালের। এক-একবার ভাবে—থাক গে, সোনাদানায় কাজ কী, এখানেই থেকে যাই। আবার যেই একটা সিঁড়ি মোছা হল, নীচে নেমে অন্য একটা সিঁড়ি মুছতে শুরু করে, তাকের ওপর থরে থরে সাজানো গয়নাগাঁটির ওপর চোখ পড়ে যায় আর প্রাণটা আনচান করে ওঠে। এত গয়না যে কারও ঘরে থাকতে পারে ওদের গাঁয়ের লোকে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। এ সব নিয়ে তাদের কাছে উদয় হলে আগেকার দুষ্কর্মের কথা কেউ মুখেও আনবে না। অমনি রাজা-মহারাজা খেতাব দিয়ে পায়ের ধুলো মাথায় মাখবে। রাখাল তার নখ-ফাটা, খড়ি-ওঠা পায়ের দিকে চেয়ে ভাবে—চোরদের পা এইরকমই হয়। আবার যেই দু-একটা গয়না বেচে পয়সা পাব, পায়ে তেলজল পড়বে, পাম্পশু উঠবে, জমিদারবাবুর পায়ের সঙ্গে এর কোনো তফাত থাকবে না।

তবু এ জায়গাটা যে বেশ সে কথা মানতেই হবে। তবে ভুতোর কাছে সে কথা স্বীকার করা নয়। এমনিতেই এখানে ভুতোর মন বসে

গেছে। এখানে বুড়ি মাকে আনার কথা ভাবে সে। তার কাছ থেকে গয়না সরানোর ব্যাপারে কতখানি সাহায্য পাওয়া যাবে সেটাই হল একটা খুব বড় সমস্যা। মনটা বাস্তবিক খুব খারাপ হয়ে যায়।

তবু সিঁড়ি মুছতে মুছতে ফন্দিটা পাকিয়ে নেয় রাখাল। এই তিন দিনে লাইব্রেরি বাড়িটার প্রত্যেকটি আনাচ-কানাচ গলিঘুঁজি চেনা হয়ে যাচ্ছে। কোন্ সময়ে কীভাবে জিনিসগুলো সরানো যায় আগে থাকতেই ঠিক করে ফেলতে হবে। কাজে এতটুকু ত্রুটি রাখলে চলবে না, তাহলে ম্যানেজার সন্দেহ করতে পারেন যে রাখালের মনে অন্য মতলব আছে। শেষ দিন সবার কাছে জাহির করতে হবে যে সে আস্তানায় ফিরছে, কিন্তু আসলে আস্তানায় না ফিরে সুখী বলে মেয়েটা যেই দোতলার বড় হলের সব আলো নিবিয়ে, তারপর বড় সিঁড়ির আলো নিবিয়ে নীচে চলে আসবে, সেই সময় দোতলার ঘন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। তারপর সব নিঝুম হয়ে গেলে গয়নার পুঁটলি বগলে কলঘরের পাশের খিড়কি খুলে বেরিয়ে পড়তে কতক্ষণ! সব দরজাতে ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে কেবল সদরে বাইরে থেকে তালা দিয়ে সকলে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি চলে যায়। শুধু পড়ুয়ার দল সম্বন্ধে সাবধান হতে হয়, তারা কিছুতেই বই ছেড়ে নড়তে চায় না।

এখানে থাকলে পয়সা খরচ করে তেল সাবান কিনতে হয় না। আস্তানার তাকে তাকে সব সাজানো আছে, দরকারমতো নিলেই হল। পয়সাকড়ি দিয়ে এখানে কিছু কেনবার দরকার নেই। ইস্কুলের মাইনে লাগে না, হাসপাতালে মিনি পয়সায় চিকিচ্ছে হয়। সুখীর কাছে শোনা যে আরও অন্য হাসপাতাল আছে—সেখানে রাগীদের, অসভ্যদের, দুষ্টু লোকদের চিকিচ্ছে হয়, ওষুধ খেয়ে তাদের নাকি রাগ পড়ে যায়, ভদ্রলোক ভালোমানুষ হয়ে যায়। এত কথা অবিশ্যি রাখালের বিশ্বাস হয় না। যাই হোক, গয়নাগুলো হাতিয়ে নিয়ে এখানে যে কোনো সুবিধে করা যাবে না, এটা ঠিক। কেউ কিনবে না সোনা। দেশে ফিরতে হবে—তার জন্য নৌকো কিংবা গাড়ির ব্যবস্থা করা দরকার। ভুতোকেও জিনিস বয়ে নৌকোয়

যেতে হবে, একা আর কতটুকু নেওয়া যাবে। দিকদারের সঙ্গে পষ্ট একটা ফয়সালা করতে হবে।

সিঁড়ির রেলিঙের ফাঁক দিয়ে রাখাল দেখতে পায়—সুখী আর ময়নাদিদি বলে একজন বুড়ি সোনার গয়নাগুলোকে ঝাড়পোঁছ করছে, তাকের উপর থেকে ঢিবি করে সেগুলোকে মেঝেতে নামিয়েছে, আলো পড়ে সেগুলো জ্বলছে যেন আগুনের পাহাড়! ছোটবেলা থেকে এইরকম সুযোগেরই স্বপ্ন দেখেছে রাখাল। হাত দুটো নিশপিশ করতে থাকে।

লাইব্রেরিটা দেখতে প্রকাণ্ড হলেও, একতলায় একটি বিরাট হলঘর, আর দোতলায় আর-একটি, তারপর ছাদের কাছে চারদিক ঘুরে চওড়া বারান্দার মতো, সেখানে সারি সারি আলমারি বই দিয়ে ঠাসা। সেইখানেই পড়ুয়াদের সবচেয়ে বেশি ভিড়, মাঝে মাঝেই বই নিয়ে টানাটানি হতে দেখা যায়। একতলা থেকে তিনতলায় যাবার অসংখ্য সিঁড়ি হাজার হাজার লোকের ওঠানামায় ধুলোয় ধুলোময় হয়ে যায়, সেইগুলোকেই রোজ মুছে সাফ করতে হয়।

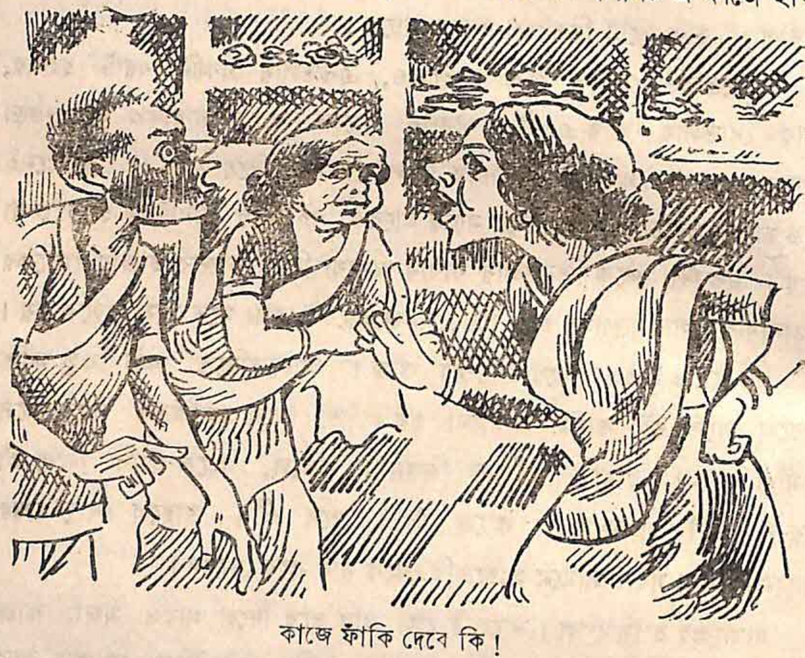
সিঁড়িমোছা হল গিয়ে শাস্তির কাজ। লাইব্রেরিতে কেউ কিছু ক্ষতি করলে তাকে এই কাজে লাগানো হয়। তা ছাড়া জনাকতক বারোমেসে কর্মীও আছে। রাখাল সুখীকে জিজ্ঞাসা করলে, কাজে ফাঁকি দিলে কী হয়? সুখী তো অবাক। কাজে ফাঁকি দেবে কী! তাহলে যে দু' নম্বর ম্যানেজারবাবু সবার সামনে লাইব্রেরি থেকে বার করে দেবেন।

রাখালের হাসি পেল। ভালোই তো, বার করে দিলে আরও মজা, কাজ করতে হবে না! ময়নাদিদি তার কথা শুনে এমনি চমকে উঠল যে তার হাত থেকে একটা সাতনরি পড়ে গিয়ে তার জোড়া খুলে গেল। সুখী সেটিকে আলাদা করে রেখে দিয়ে বলল—দেখো দিদি, তোমার মেয়াদ আর একদিন বাড়ল।

ময়নাদিদি সে কথা কানে না তুলে, রাখালকে বললে,—কী রকম লোক গা তুমি? কাজ না করবে তো করবেটা কী শুনি? কাগরাও কাজ করে। রাখাল বললে—হ্যাঁ! তাই না আরও কিছু! কাগরা আবার কী কাজ করে? ময়নাদিদির কথায় বোধ হয় কুলিয়ে উঠল না, সে সুখীর

দিকে তাকাল। সুখী ঝাড়ন তুলে নিয়ে বললে—কাগদের যা কাজ, ময়লা খেয়ে সাফ করা, বাসা বানানো, বাচ্চা পালা, ইত্যাদি নানারকম কেগো কাজ! নাও, এখন হাত চালাও তো দেখি।

রাখাল আবার সিঁড়ি মুছতে থাকে আর ভাবে, এসব হল বাড়তি কাজ, এতেও এদের উৎসাহ কত! সারাদিন গাছ ছাঁটার কাঁচি চালিয়ে রাখালের হাতে এমনিতেই ব্যথা ধরে গেছে, তার ওপর এক মিনিট এ কাজে হাত



কাজে ফাঁকি দেবে কি!

জিরুলেই কার চোখে পড়ে যাবে এই ভয়! শেষটা সত্যি যদি দু' নম্বরের ম্যানেজারবাবু বার করে দেন তবেই তো চিত্তির।

ভুতো দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে। সে এখানকার গানের দলে গিয়ে ভিড়েছে। সারাদিন গাছের কাজ করে, সন্ধ্যেবেলায় গানবাজনায় তার সময় মন্দ কাটছে না। সত্যি কথা বলতে কি, তাকে আর চেনাই যায় না। তার যে এমন গানের গলা তাই বা কে জানত! সেই কথা বলাতে ভুতো একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিল, কেন, ছোটবেলা থেকেই তো আমি গান গাই, আমাদের বাড়ির সবাই গান গায়।

রাখাল টিটকিরি দিয়ে বলেছিল—আর তুই চুরি করিস, জেল খাটিস। সেই ইস্তক ভুতো কেমন যেন গুম হয়েই আছে। অবিশ্যি অন্যদের সঙ্গে গালগল্প হাসি ঠাট্টা চলে। গাছের কাজটি ভারি পছন্দ, খুব আনন্দে তার দিন কাটে, যত রাগ শুধু রাখালের ওপরে, যে রাখাল তার একমাত্র বন্ধু ও স্যাঙাত; আর শুধু স্যাঙাত কেন, একরকম গুরু বলা বলে। চিরকাল রাখাল মতলব এঁটে এসেছে, ভুতোকে যেমন যেমন বলেছে, সে মুখ বুজে তেমনি করে গেছে। এখনকার এই ভুতো যেন অন্য কেউ।

চারটে থেকে রাত দশটা অনেকখানি সময়, সন্ধ্যে সোয়া সাতটায় আধঘন্টা টিফিনের ছুটি। তখন লাইব্রেরির ক্যান্টিনেই গরম গরম রুটি তরকারি দুধ খায় সবাই। তারপর আবার পৌনে আটটায় কাজে লেগে যায়। খেতে খেতে রাখাল বলে বসল—এসব খাবার-দাবার খরচা কে দেয়? সরকার বুঝি?

পাশের লোকটা তো হাঁ! সরকার? সরকার দেবে কেন? কোন্ সরকারের কথা বলছ ভাই? রাখাল তার বুদ্ধি দেখে অবাক—আরে গবরমেট, গবরমেট গো। আমাদের দেশে জেলখানার সব খরচ গবরমেট চালায়। বলে রাখাল খুব হাসতে থাকে, যেন ভারি দেমাক করার বিষয় হল। লোকটা বললে—কী জানি, চিনি নে। কাজ করি খাইদাই, তার বেশি কী জানি, মুখ্যু মানুষ!

রাখাল বললে—কেন, তুমি লিখতে পড়তে জান না?

লোকটা হেসে ফেলল।—আহা, সে আর কে না জানে। আমি বিদ্যের কথা বলছিলাম।

রাখাল জিসগেস করলে—এখানে কি সবাই লেখাপড়া জানে নাকি?

তা জানবে না? ষোলো বছর বয়স অবধি সব্বাইকে যে ইস্কুলে যেতে হয়। তুমি কি—

রাখাল রেগে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, হট্টমালা থেকে আসছি, আমি লিখতে পড়তে জানি না।

লোকটা বললে—আহা! শিখবে নাকি?

রাখাল মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠে পড়ল। বাটিভরা ঘন সুগন্ধ দুধটা মুখে বিস্বাদ লাগছিল।

তেরো

কাজ সেরে আস্তানায় পেঁছতে রোজ সাড়ে দশটা বেজে যায়, ভুতোদের গানের মজলিশও সেই সময় ভাঙে। পাশাপাশি মাতুর পেতে বালিশ মাথায় শোয় দুজনে, তবু আসল কথাটা বলা হয় না। ভুতো শোবামাত্র নাক ডাকতে থাকে, বোধ হয় কথা বলবার ইচ্ছেই নেই তার। রাখালও ছাড়ে না; চার দিনের মধ্যে দুদিন এমনিতেই কেটে গেছে, তবে কাজ যে কিছুই এগোয় নি তাও বলা যায় না; সমস্ত আটঘাট বেঁধে মতলব পাকা হয়ে গেছে, এখন শুধু কাজে লাগানোটুকু বাকি। ভুতোকে লাইব্রেরির মধ্যে না ঢোকানই ভালো মনে হল, কোথা থেকে কার কাছে কী বলে বসবে কে জানে! তার চেয়ে সে খিড়কির বাইরে অপেক্ষা করুক, তার হাতে একটা পোঁটলা পাচার করে দিয়ে, অন্যটা নিজের কাঁধে তুলে একেবারে নদীর ঘাটে। সেখানে নৌকো থাকা চাই। দিকদারের কাজ রাখাল করে দেবে নিশ্চই, কিন্তু তার বদলে দিকদারকেও এটুকু করতেই হবে। রাখালের সঙ্গে তার দেখাই হয় না, কাজেই তাগাদাও দেওয়া যায় না, ওদিকে রোজই ভুতোর সঙ্গে তার নানান কাজের কথা হয়। ভুতোর কাজ দেখে সে নাকি খুব খুশী, খুব নাকি সুখ্যাতি করে, অথচ ভুতো তাকে দেশে যাবার কথাটা কিছুতেই মনে করিয়ে দিচ্ছে না।

আর সময় নেই; যা করবার এখুনি করতে হবে। রাখাল ভুতোর কোঁকে দারুণ এক গুঁতো দিয়ে বললে—পরশু দেশের দিকে রওনা হব। নৌকোর কী করলে?

ভুতো পিঠ ফিরে শুয়ে বলল—সে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এখন আমার ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম পাচ্ছে? ঘুম পাচ্ছে আবার কী? এই কি ঘুম পাবার সময় নাকি? জীবনে হয়তো আর কখনো বড়লোক হয়ে যাবার এমন সুবিধে হবে না, আর

ভুতোর কি না ঘুম পাচ্ছে! হতভাগা জন্মে কখনো একটা ভালো জামা গায়ে দিল না, পেট ভরে ভালমন্দ অন্তত এখানে আসবার আগে কখনো খেল না, সারা জীবন কেবল গালমন্দ শুনেই কাটাল, আর এখন যদি বা বড়লোক হবার একটা সুযোগ হল, ব্যাটার কি না ঘুম পাচ্ছে! রাগে রাখালের সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

কান ধরে টেনে ভুতোকে একবারে উঠিয়ে বসিয়ে দিয়ে বললে, কথাটা কানে গেল, নাকি অমনি অমনি বলছিস যে নৌকোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে? কাল অবধি তো হয় নি। দিকদারের সঙ্গে দেখা হয়েছে? ভুতো কানের গোড়ায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল—তার সঙ্গে কী করে দেখা হবে? তার পেছনে ফেউ লেগেছে বলে সে তো ফেরারি হয়ে গেছে। তাকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না।

এই বলে একটা হাই তুলে ভুতো যেই না দিব্যি নিশ্চিন্ত আরামে আবার শুতে যাচ্ছে, রাখাল হাউ হাউ করে কেঁদে তার পা-দুটো জড়িয়ে ধরল। ভুতো তো অপ্রস্তুতের এক শেষ। জিভ-টিভ কেটে রাখালের হাত ধরে ফেলল—ও কী, ছি ছি! ওতে আমার পাপ হবে। একদিন তোকে না গুরু বলে পেন্নাম করেছিলাম, ভুলে গেছিস? সত্যিই কাল রাত নটা থেকে ঘাটে আমাদের জন্যে নৌকো তৈরী থাকবে, তাতে দুটো দাঁড় থাকবে, তবে সঙ্গে লোক যেতে রাজী নয়। নিজেদেরই পথ খুঁজে নিতে হবে।

রাখাল একেবারে হাঁ হয়ে গেল।

দিকদারই যদি ফেরারি হল তো এত কথা তোকে বললে কে?

কেন, ঐ যে দিগম্বর বলে দিকদারের একটা শেয়ালপনা লোক আছে, সেই বলল।

কাল আবার কী? আমি তো পরশু যাবার কথা ঠিক করেছিলাম।

ভুতোর এবার বোধ হয় সত্যিই ঘুম ছুটে গেল। নিচু গলায় সে বললে, নারে, যেতে হলে কালই যেতে হবে, দিগম্বর বললে। তারপরে কী হতে কী হয়ে পড়বে তার ঠিক কী? দিকদারকে এরা যদি একবার ধরতে পারে তাহলেই তো সব পণ্ড হয়ে যাবে। এক সুই দিয়ে নাকি দিকদারের

রোগ সারিয়ে দেবে। তখন সে আর আমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না, বরং দলের আর সবাইকে উলটে চিকিচ্ছে করিয়ে সারাবে, আগের মতো হয়ে যাবে।

রাখাল বললে—সে আবার কী?

ভুতো আরো বুঝিয়ে দিলে—সেই যে কে যেন বলেছিল দিকদার আগে ভালো ছিল, তার পর কোথায় বনের মধ্যে গাছের চারা খুঁজতে গিয়ে কিসের কামড় খেয়ে জ্বর পাকিয়ে একদম বদলে গিয়ে এইরকম হয়ে গেছে। এখানকার বদ্যিরাও সেই বনে গিয়ে সেই পোকা ধরে এতদিন পরে দারুণ ওষুধ বানিয়েছে, তাই ওরা দিকদারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর খবর পেয়ে দিকদারও গা ঢাকা দিয়েছে। মোট কথা, যেতে হয় তো কালই যাওয়া।

এই অবধি বলে ভুতো সেই যে চোখ বুজে টান হয়ে শুল আর শত খোঁচাখুঁচিতেও উঠল না। কিন্তু রাখালের চোখে আর ঘুম আসে না। সে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল—তাই ভালো, যত শিগগির এখান থেকে রওনা হওয়া যায়, ততই ভালো। এ জায়গাটার কেমন যেন একটা গুণ ধরে যায়, বেশি দিন থাকলে শেষটা ভুতোর মতো আর যেতে ইচ্ছেই করবে না। আহা, এখানে নাকি না খেয়ে কেউ মরে না; সবাইকে কাজ করতে হয় সত্যি, কিন্তু না করলে কেউ ধরে নিয়ে সাজাও দেয় না। দিনের বেলায় এখানকার পাঠশালার সামনে দিয়ে যেতে রাখাল দেখে এসেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে-গুলো রঙিন জামা গায়ে দিয়ে গুরুমশায়দের সঙ্গে নেচে নেচে গান গাইছে আর চারদিকে ফুল ফুটে রয়েছে। বেড়ে জায়গা, যাই বল!

দুঃ! এসব কী ভাবছে রাখাল? যেমন এখানে কেউ না খেয়ে মরে না, তেমনি বড়লোকও তো কাউকে দেখল না রাখাল। টাকা-পয়সার আয় নেই, তা বড়লোক হবে কোত্থেকে? নাঃ, যতই না ভালো হোক, এখানে আর নয়। কোনোমতে কালকের দিনটা কাটলে বাঁচা যায়, ডেরা থেকে দুটো গামছায় কাগজগুলোকে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে রাত দশটার পর সবাই লাইব্রেরি থেকে চলে গেলে, ব্যস্ আর কি, কাগজগুলোকে চারদিকে ছড়িয়ে, দু' পোঁটলা গয়নাগাঁটি নিয়ে ঘাটে গিয়ে নৌকোয় চাপা। নাই বা গেল কেউ সঙ্গে,

নৌকোয় একবার উঠতে পারলে পথটুকু খুঁজে নেওয়া কী এমন শক্ত কাজ? এর চাইতে কত বিপদ থেকে রাখাল নিজেকে আর ভুতোকে উদ্ধার করেছে।

পাশ ফিরে শুয়ে দেখে রাখাল চাঁদ কখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, তারার আলোয় চারদিক ছমছম করছে, ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। একটু অদলবদল করে নিতে পারলে রাখালেরও থেকে যেতে আপত্তি হত না। ঐ বিনি পয়সায় দোকান থেকে জিনিস কেনা, ওটি তুলে দিতে হবে। যেমন খাটছে খাটুক সবাই, তবে মাসকাবারে মাইনে পাক, ভুঁইতরাসির মতো দোকান-পাট থেকে জিনিসপত্র কিনে খাক পরুক। একটা হাই তুলে আরো ভাবে রাখাল, দোকানপাটগুলো সব যদি রাখালদাসের হয় তবে আরো ভালো; দোকান চালাবার ভার দেওয়া যাবে ভুতোকে। সেও মাস মাইনে পাবে, বাকি পয়সাকড়ি রাখালের তহবিলে জমা হবে।

তারপর একটা একটা করে সব দোকানগুলোকে কিনে নিতে পারলে ইচ্ছেমতো জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে পারবে, তখন যারা দোকানে কাজ করবে আর যারা কিনে খাবে, সবাই রাখালের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে—তখন চাই কি—স্বয়ং দিকদারকেও আর রাখাল ভয় করবে না, সে ব্যাটাকেও—এই রকম সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতে কখন যে রাখাল ঘুমিয়ে পড়ল নিজেই টের পেল না।

পরদিন ভোরে ভুতোর ডাকে উঠেই রাখালের খেয়াল হল—সেই গভীর রাতের আগে, দুপুরে খাবার সময়টুকু ছাড়া ভুতোর সঙ্গে তো আর দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। খাবার সময়েও আশেপাশে বড় বেশি লোকজন থাকাতে নিরিবিলি কথা কইবার জো নেই।

সারাদিন ভুতো কমলার বাগানে আগাছা উপড়োবে আর রাখাল বাকশালের পুকুর ছেঁচবে। কাজেই যা বলবার এখুনি বলা দরকার। ভুতোকে ডাক দিল রাখাল, নিচু গলায় বল্ল, তোর সঙ্গে সেই ঘোর রাতের আগে আর কথা হবে না, কাজেই ভালো করে শোন্। রাত স্যাড়ে দশটায় তুই লাইবেরির খিড়কি দোরের বাইরে জুঁইগাছের আড়ালে অপেক্ষা করবি। সবাই বেরুলে পর আমি

আদ্ধেক জিনিস পুঁটলি বেঁধে দোর ফাঁক করে তোর হাতে গুঁজে দেব, তুই অমনি নদীর দিকে রওনা দিবি, নৌকোতে জিনিস লুকিয়ে চুপ করে বসে থাকবি। আমি কাগজ বিলি করে, আরেকটা পুঁটলি নিয়ে একটু পরেই এসে জুটব। তারপর সোজা ভুঁইতরাসি। নৌকো সত্যি থাকবে তো?

ভুতো ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্ল, থাকবে, থাকবে। কিন্তু দেশে যাবার পথ চিনিস তো?

রাখাল বিরক্ত হয়ে উঠল—ওসব আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে যা বলছি তাই করিস। এখন যা, আমাদের বেশিক্ষণ কথা বলতে দেখলে আবার কেউ না সন্দেহ করে।—করে না অবিশ্যি, এখানে কেউ কাকেও সন্দেহ করে না।

রোজকার মতো হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে কাজের জন্যে তৈরী হল রাখাল, আর খালি খালি মন কেমন করতে লাগল। এই ফুলে ফলে ভরা বাগানে, এই খোলামেলা জায়গায়, ঝিরঝিরে বাতাসে মাদুর পেতে আর শোয়া হবে না। আজ রাতটা হয়তো নৌকোতে কাটবে, কাল আবার সেই ভুঁইতরাসির চেনা মাটিতে পা পড়বে।

ভুঁইতরাসির জল-হাওয়াতে জন্মেছিল মানুষ হয়েছিল রাখাল, সেখানকার পাঠশালা থেকে তাড়া খেয়ে, কিছুকাল ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়িয়ে চোর-ছ্যাচড়দের দলে ভিড়েছিল। ভুঁইতরাসি যাবে না তো যাবে কোথায়? এত সোনাদানা ওখানকার লোকে চোখেও দেখে নি কখনও, হকচকিয়ে যাবে সব, রাখাল-ভুতোকে ফাটকে দেবার কথা কারও মনেও হবে না। তারপর আর কি, এখানে যা হতে পারবে না, ভুঁইতরাসিতে তাকে সম্ভব করবে রাখাল। গোটা বাজার কিনে ফেলবে, যেখানে যত চাল নুন সব নিজের গোলায় জমা করবে, ইচ্ছেমতো দাম চড়াবে। দেখতে দেখতে ফেঁপে লাল হয়ে যাবে। তখন আর কেউ তাকে ঘেন্না করবে না, সিঁদেল চোর বলে নাক সিঁটকোবে না। অবিশ্যি এটুকু মানতেই হবে যে ভুঁইতরাসিতে সিঁদেল চোরদের রাজা বলে রাখালের নাম হয়েছিল।

কিন্তু রাজা হলে হবে কি, ট্যাঁক ছিল গড়ের মাঠ, কাছে কেউ ভিড়তে দিত না। এবার সোনার পাহাড় নিয়ে গিয়ে উঠবে সেখানে, অমনি সবাই এসে পায়ে লুটোবে। তখন দেখা যাবে।

কোন রকমে দিনটা কাটল, আট ঘণ্টাকে মনে হল আট বছর। শেষটা সত্যি সত্যি বেলা চারটে বাজল, শেষবারের মতো পুকুর ছেঁচার কাজ সেরে হাত মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে রাখাল লাইব্রেরিতে হাজির হল। শেষবারের মতো সিঁড়ি মোছার কাজে লাগল। মনটা কেমন খারাপ হয়ে রইল। মন্দ নয় এখানকার লোকরা। যদিও ব্যবসা-ব্যাণিজ্য কিছুই বোঝে না, কিন্তু সবাই সবাইকে ভারি সাহায্য করে। রাখালের হাঁড়ি মুখ দেখে দু' নম্বর ম্যানেজার বারবার এসে জিজ্ঞেস করে গেলেন ওর শরীর খারাপ কিনা।

ক্রমে বেলা পড়ে এল, জলখাবার এল, রাখালের যেন পেটকামড়ানি শুরু হয়ে গেল, ভালো ভালো পুরী তরকারীগুলো মুখে তুলতে পারল না। শেষবারের মতো হলঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল, সোনার গয়নার তাল তাকের ওপর এমনি খোলা পড়ে আছে। রাত দশটার পর ওপরের আলো যেই নিববে, সেখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। আলো নেবার কথা মনে করে কেন জানি বুক টিপঢিপ করতে লাগল, অথচ সঙ্গে দেশলাই বাক্স আছে, ভাবনার কোনও কারণই নেই।

আসলে এভাবে কাজ করে অভ্যেস নেই। গত দশ বছরে কম চুরি তো করে নি রাখাল, জেলই খেটেছে চারবার। কিন্তু সে সবই বাইরে থেকে সিঁদ কেটে ভেতরে সেঁদিয়ে চুরি করা। এবার যেন সবই উলটো, ভেতর থেকে চুরি করে দোর খুলে বেরিয়ে পড়া। কাজটাকে কি রকম যেন অন্যায় অন্যায় মনে হচ্ছিল।

যাই হোক, শেষটা রাত দশটা বাজল, অমনি রোজকার মতো ঠেলাঠেলি পড়ে গেল, এক দল পোড়ো কিছুতেই উঠতে চায় না, নাকের ওপর চশমা টেনে বই আঁকড়ে ঝুলে থাকে, টানাটানির মধ্যেও যে ক লাইন পারে পড়ে নেয়। শেষটা তাদের হার মানতে হয়, দুঃখিত মুখে বই জমা দিয়ে গুটি গুটি বাড়িমুখো হয়, একে একে লাইব্রেরি-বাড়ির আলো নেবে।

দোতলায় যখন সব আলো নিবে গেছে তখন তু' নম্বর ম্যানেজারকে শুনিয়ে রাখাল বললে—উওফ্, আজ বড্ড ঘুম পেয়েছে, বাড়ি গিয়ে শুয়ে বাঁচব! তারপরেই এক সুযোগে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে গা ঢাকা দেওয়া!

কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘর খালি হয়ে গেল, তু' নম্বরের ম্যানেজার তু-একবার হাঁকডাক করলেন যদি কেউ পড়ে থাকে, তারপর তিনিও শেষ আলো নিবিয়ে, সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে থেকে তালা দিলেন, তারপর সব চুপচাপ।

সে যে কী বিশ্রী চুপচাপ সে আর বলা যায় না। মনে হতে লাগল ঘুটঘুটে অন্ধকারে কাদের যেন ফোঁসফোঁস নিশ্বাস পড়ছে, কার যেন হাঁটু মটকাল, রাখাল তো ভয়ে সাদা! কোনোমতে হাতড়ে হাতড়ে নিচে নেমে দেখে একেবারে অন্ধকার নয়। ছাদের কাছের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে তারার আলো এসে সোনার গয়নার ওপর পড়ে আলো ঠিকরোচ্ছে। নিঃশব্দে এদিকে ওদিকে কাগজ ছড়িয়ে তারপর খান কুড়ি-বাইশ গয়না গামছায় বেঁধে খিড়কি দোরের কাছে গিয়ে খুট করে ছিটকিনি নামাল রাখাল।

সেই ছোট্ট খুট্ শব্দটা একশো গুণ জোর হয়ে যেন ছাদ থেকে দেয়াল থেকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, রাখালের প্রাণ-পাখি প্রায় খাঁচাছাড়া! কিন্তু এখন পেছু হটলে সব পণ্ড, অনেকখানি মনের জোর করে রাখাল খিড়কিদোর একটুখানি ফাঁক করল। বাইরে তারার আলো ফুটফুট করছে, জুঁই-গাছের ছায়া থেকে ভুতো এগিয়ে এসে হাত বাড়াতেই, তার হাতে পুঁটলি গুঁজে দিয়ে, কোনো কথা না বলে, খিড়কি দোরটা রাখাল ভেজিয়ে দিল। পাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল, ভুতোও অমনি এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে ছায়ায় ঢাকা পথ ধরে চোঁ চাঁ দৌড় লাগাল।

এদিকে নিজের বুকের ধড়াস ধড়াস শব্দে রাখালের কান ঝালাপালা, তাকের ওপর ঝুঁকে পড়ে তু হাতে মণিমাণিক্য-বসানো গয়নাগাঁটি আরেকটা গামছায় ঢালছে আর খালি মনে হচ্ছে বুঝি ঘরভরা লোক পা টিপেটিপে নড়াচড়া করছে, ঐ তাদের নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে! শেষটা

আর থাকতে না পেরে ফস করে রাখাল একটা দেশলাইকাঠি জ্বালল। আর অমনি ধর-ধর সর-সর করে এক দল ছায়ামূর্তি ঘরের চারদিক থেকে জড়ো হাত লাগল।

আর দাঁড়াল না রাখাল, বিকট একটা চিৎকার দিয়ে গয়নাগাঁটি কাগজপত্র সব ফেলে এক দৌড়ে খিড়কি দোর খুলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তখন পড়ুয়ারা সব অবাক হয়ে আলো জ্বেলে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তর্কচঞ্চু বললেন, আহা! এগুলো হয়তো ওর দরকার, ভয় পেয়ে ফেলে পালাল। রোজ তোদের পই পই করে বলি, দশটার পর তোদের অত পড়াশুনোর কী দরকার? আমরা বুড়ো হয়েছি, বেশি সময় পাব না, আমাদের কথা আলাদা। ছাখ্ দিকিনি, এই বেচারিকে না অসুবিধেয় পড়তে হয়। যা, যা, পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে দিয়ে আয় গে যা। তাই শুনে গামছাটা গুটিয়ে নিয়ে পাঁচ-ছজন পড়ুয়া রাখালের পেছন পেছন দৌড়ল। তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে রাখাল বাতাসের মুখে খড়ের কুটোর মতো ছুটল। ভুতোর হাতের পুঁটলিতেও কম জিনিস নেই, এখন এরা ধরে ফেলবার আগে নৌকোয় চাপতে পারলে আর ভয় নেই, রাখালের সমান দাঁড় বাইতে যে পারবে সে এখনও জন্মায় নি। কোমরে যে কখানি কাগজ গোঁজা ছিল সেগুলোও আপনা থেকেই বাতাসে উড়ে যেখানে সেখানে পড়তে লাগল, তার জন্যেও রাখালকে থামতে হল না।

চোদ্দ

বাতাসের মুখে খড়ের কুটোর মতো ছোটে রাখাল, কেন ছোটে নিজেই জানে না। লাইব্রেরির ভেতরকার কালো মূর্তিগুলোও পেছন পেছন ছুটছে টের পায়। তাদের 'ও মশাই', 'দাঁড়ান', 'থামুন', ইত্যাদি নানান চিৎকারও কানে আসে ; নিজের হাত খালি ; এ দেশে পুলিশ বা জেলখানা কিছুই নেই ভালো করেই জানে সে ; ধরলে শুধু নিন্দে করবে ; হয়তো বলবে—ছিঃ, অমন করতে নেই! তবু প্রাণপণে ছোটে রাখাল। বুক ধড়াস ধড়াস করে ; ভয়ে নয়, কালো মূর্তিগুলো যে মোটেই ভূত নয় তাও বুঝেছে রাখাল, ভূত কি আর ভূতের বাড়ি ছেড়ে পথে বেড়িয়ে 'ও মশাই', 'ও মশাই' করে ডাক ছাড়ে? তবু সমানে দৌড়তে থাকে রাখাল। ঐ দেখা যায় নদী, ঐ নদীর ঘাট।

নদীর ঘাটে মেলা লোকজন, লণ্ঠন, মশাল, চ্যাচামেচি। বুকটা ধড়ফড় করে উঠল, সব জানাজানি হয় নি তো? নৌকো আটকে রাখলে আর দেশে ফেরা হবে না! ভুতোকে ধরে নি তো? নাঃ, ঐ তো দেখা যায় ঘাট থেকে দশ হাত তফাতে ছোট্টো নৌকোয় ভুতো বসে হাত পা নেড়ে চ্যাচামেচি করছে। তবে কি—তবে কি ঘাটে এসেও সব পণ্ড হয়ে গেল? না, তাও তো নয়, আরেকটু কাছে এসে অনেকগুলো লণ্ঠনের আলোয় দিকদারকে চিনল রাখাল। আঃ, বাঁচা গেল, দিকদার যখন নিজে এসেছে, তখন আর কোনো ভয় নেই। দিকদারের কাজ রাখাল করে দিয়েছে ; এবার রাখালের দেশে যাবার ব্যবস্থা দিকদারও নিশ্চয়ই করে দেবে। লোকে বলে তার মেজাজ যেমনই হোক না কেন, তার কথার কখনও নড়চড় হয় না। তা হলে ফেরারী হয় নি দিকদার।

রাখালকে দেখতে পেয়ে ঘাটের লোকেও মহা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল—ঐ যে, ঐ যে আরেকটি এসেছে, দাও এবার ঠুসে!

কিছুই বুঝতে পারে না রাখাল, নৌকো থেকে ভুতো ব্যস্ত হয়ে কেবল হাত নেড়ে চলে যেতে ইসারা করে। কী যেন বলেও, কিন্তু নদীর হাওয়া তার কথা উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঘাটের আলো তার মুখে পড়ছে, মনে হচ্ছে কোনও কারণে বড্ড ভয় পেয়েছে, অথচ তার পাশেই দেখা যাচ্ছে গামছায় বাঁধা গয়নার পুঁটলি, ছোটার বেগ সামলাতে না পেরে রাখাল একেবারে দিকদারের বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দিকদারও অমনি তাকে দু হাতে জাপ্টে ধরে, কাকে যেন হেঁকে বলে, দেখছেন কী, লাগান একে আমার চেয়েও বড় ডোজ!

চোখের কোনা দিয়ে রাখাল দেখতে পায় লাইব্রেরির লুকোনো পোড়োরা গামছায় বাঁধা অন্য পুঁটলিটাকেও এনে হাজির করেছে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে পায় যে এই বড় একটা ইন্‌জেক্সনের সূই হাতে নিয়ে একজন যণ্ডামতো ডাক্তারবাবু তারই দিকে এগিয়ে আসছেন! গায়ের জোরে হাত পা ছুঁড়তে থাকে রাখাল, ডাক্তারবাবু ইতস্তত করেন। দিকদার বলে—কী দেখছেন ডাক্তারবাবু? ওর সাকরেদের রোগ আমাদের এখানকার জলহাওয়া লেগেই সেরে গেছে। কিন্তু এ হতভাগার ব্যামো আমার চেয়েও কড়া।

অমনি দিগম্বরটা পাশ থেকে বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিকদারের ব্যামোই যখন সেরে গেল, আমাদেরও সারল, তিনগুণো ওষুধ দিলে এ ব্যাটারাও সেরে যাবে।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজনে মিলে রাখালকে পেড়ে ফেলল আর ডাক্তারবাবু তার পেছনে প্যাঁট করে সূই দিয়ে দিলেন!

সে যা চ্যাচাল রাখাল, গাছ থেকে ঘুমন্ত কাগরা সব কা-কা করে উড়ে পড়ল। পোড়োরা গয়নার পুঁটলি বাগিয়ে ধরে বারবার বলতে লাগল, এই নিয়ে যাও, এ সব বোধ হয় তোমার দরকার। কিন্তু কে কার কথা শোনে! যেই না ডাক্তারবাবু সূইটা টেনে বের করে নিয়েছেন আর দিগম্বররাও রাখালকে ছেড়ে দিয়েছে, অমনি এক লাফে রাখাল ঘাট থেকে একেবারে ভুতোর নৌকোর ওপর পড়েছে।

সে ছোট নৌকো, অত ভার সইবে কেন! সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্ণি খেয়ে একেবারে জলের নীচে তলিয়ে গেছে। এক মুহূর্ত চোখে সর্ষেফুল দেখল রাখাল, তারপর সব অন্ধকার।

ফের যখন চোখ মেলে চাইল, দেখে ঐ তো কিছুদূরেই ভুঁইতরাসির দক্ষিণে গঞ্জের ঘাট দেখা যাচ্ছে, রাখাল বালির চরায় পড়ে আছে। উঠে বসে দেখে ভুতোও তার সামনেই আসন পিঁড়ি হয়ে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রাখাল—ও কী রে, কাঁদছিস্ যে? সুঁইয়ের ব্যথা হয়েছে বুঝি?

ভুতো নাক টেনে বললে—নারে, আমাকে সুঁই দেয় নি, ব্যামো এমনি সেরেছে। আমি ভাবলাম তুই মরে গেছিস, তাই কাঁদছি।

রাখাল বললে, তোর মতো বোকা তো আর দেখি নি। নে ওঠ্, আগে হারু মোড়লের কাছে, তারপর তোর মা কেমন আছে দেখিগে চল্।

এই বলে নদীর পাড়ে গিয়ে নিজের কোমর থেকে সিঁদকাঠিটা রাখাল ছুঁড়ে জলে ফেলে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল—তোরটা?

ভুতো একগাল হেসে বলল—আমারটা কবে হারিয়ে গেছে।

তখন ভোর হয়েছে, ভুঁইতরাসির মাঠে অনেক লোকের জটলা। ভুতো রাখালের কানে কানে বললে—অবিশ্যি হারু মোড়ল আমাদের দেখলেই থানায় চালান দেবে, মার কাছে আর এখন যাওয়া হবে না।

ঠিক এই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন ওদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল— এসে গেছে, এসে গেছে, আর ভাবনা নেই।

রাখাল ভুতো তো হাঁ, তাদের দেখে এত আনন্দ কিসের তারা ভেবে পায় না।

হারু মোড়ল ছুটে এসে ভুতোকে বলল—তুই না নিচু জায়গার জল কী করে বাঁধ দিয়ে উঁচু জায়গার খালে নিতে হয় তা জানিস? আয়, আয়, আমাদের শিখিয়ে দিবি চল্।

ভিড়ের মধ্যে থেকে ভুতোর মা রেগে বলল,—অ মা, লোকটার আক্কেল দেখো, পনেরো দিন খেল না দেল না ছেলেটা, অমনি টেনে নিয়ে কাজে চলল!

ভুতো ছুটে গিয়ে মাকে একটা প্রণাম করে ফেলল। রাখালও তার দেখাদেখি গড় করল। সবাই অবাক। তখন রাখাল হারু মোড়লকে বলল,—বলেই ফেলো মোড়ল, আমাদের ধরে ফাটকে দিচ্ছ কিনা?

মোড়ল যেন আকাশ থেকে পড়ল—কেন? ফাটকে কেন?

সেই যে তোমার ঘরে সিঁদ দিয়েছিলাম।

তার জন্যে পেট্‌নাইও তো কম খাও নি। নাও, চলো এখন। অনেক কাজ আছে।

অমনি রাখাল মোড়লের হাত চেপে ধরে বলল, আমাকে একটা বারোমেসে কাজ দিও, মোড়ল, পুরোনো ব্যবসাটা ছেড়েই দিলাম।

বাস্তবিক পুরোনো ব্যবসাটা ছেড়েই দিল রাখাল। মোড়ল তাকে গাঁয়ের চৌকিদারিতে লাগিয়ে দিল। সবাই বলে নাকি এত ভালো চৌকিদার ভুঁইতরাসিতে কেউ দেখে নি কখনও। ভুতোও খালকাটা জল সরবরাহ করে খুব প্রশংসা পেল। বুড়ি মা'র আজকাল অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না। তার একমাত্র দুঃখ ভুতো বাড়িতে এক কণা সোনা ঢুকতে দেয় না, বউ এলে কী মনে করবে এই নিয়ে বুড়ির মহা ভাবনা।

মাঝে মাঝে তিন-চার দিনের ছুটি নিয়ে, কাউকে কিছু না বলে দুজনে কোথায় বেরিয়ে পড়ে, ফিরে আসে একটু মনমরা হয়ে। নদীর দুই তীরের দুই দিকে, তিন দিনের পথ তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে, কোথাও সেই ছায়ায় ঘেরা সুগন্ধে ভরা কমলামের বাগানের খোঁজ পায় নি।

খুব যদি মন কেমন করে, ভুতো রাখালকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়, হ্যাঁরে, সে কি সত্যি আছে রে? আধ ঘণ্টার মধ্যে যেখানে ভেসে ওঠা যায়, তিনদিন ধরে খুঁজেও তাকে পাওয়া যায় না কেন? স্বপ্ন নয় তো রে?

রাখাল বলে—হ্যাৎ, স্বপ্ন বুঝি পনেরো দিন ধরে দুজন লোক মিলে দেখে! জায়গাটা আছে ঠিকই, তবে বোধ হয় আমাদের মনের মধ্যে।

ভুতো ফিক করে হেসে ফেলে বলে,—কি যে বলিস!

— শেষ —